শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ

(শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচারের
প্রতিবাদ এবং সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপন)

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
**শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী**
প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নিয়ামক প্রতিষ্ঠাতাচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
**শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত**

সমিতির প্রাক্তন সভাপতি-আচার্য্য
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের**
অনুসৃতধারানবস্থিত

সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
**শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক গোস্বামী মহারাজ**
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বুক্ ট্রাষ্ট**-এর পক্ষে
**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ**-কর্ত্তৃক
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ ঃ—
**শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী**
৩০ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ,
১৭ ফাল্গুন, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ, (২।৩।১৯৯৯)

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ—
**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**
১৬ বামন, ৫২৯ শ্রীগৌরাব্দ,
১ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, (ইং ১৮।৭।২০১৫)

**গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান ঃ—**

১। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**, নবদ্বীপ (নদীয়া), পঃ বঃ।
২। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)।
৩। **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ**, শক্তিগড় (জলপাইগুড়ি)পোঃ শিলিগুড়ি।
৪। **শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ**, ২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৫। **শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ**, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। **শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ বাসুগাঁও (কোকরাঝাড়) আসাম।
৭। **শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ**, পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)।
৮। **শ্রীকৃতিরত্ন গৌড়ীয় মঠ**, শ্রীচৈতন্য এভিনিউ, দুর্গাপুর-৫, (বর্দ্ধমান)।

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয়পত্রিকা প্রেস
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
নবদ্বীপ, নদীয়া।



# মুখবন্ধ

আজ হইতে পঞ্চশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন আনয়ন করিয়াছিলেন, —যে প্লাবনের একবিন্দু স্পর্শের সৌভাগ্য হইলে মুক্তিবাসনা নরকতুল্য বলিয়া মনে হয়, অমরাবতী পুরী—আকাশকুসুম মাত্র, ব্রহ্মা-শিবাদির পদও কীটসদৃশ বিবেচিত হইতে থাকে। সেই প্রেমপ্লাবন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া সঞ্চারিত হইবে বলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র স্বয়ং যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা ভগবৎ-শক্তি পরমহংস- কুলারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহার স্নিগ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে ঐশী শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে সার্থক করিয়াছেন। উহারই ফলস্বরূপে আজ সমগ্র বিশ্বে শ্রীচৈতন্য-বেদবাণী, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-ধ্বনি সদা সর্ব্বত্র নিনাদিত হইতেছে—শ্রীসূর্য্যদেব তাঁহার কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে সমগ্র বিশ্বে কোথাও না কোথাও তাঁহার পরমারাধ্যতম শ্রীগৌরহরি ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চগাত্র হইতেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, দুর্দ্দশা ও দুর্ব্ব্যাধি যাহাদিগকে অনুসরণ করিতে কখনও বিরত ও বিব্রত হয় না, সেই কতিপয় বঙ্গদেশীয় ও উৎকলীয় কবি-সাহিত্যিক পাষণ্ডগণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদগণের সম্বন্ধে তাহাদের লালিত ভ্রান্তিবিলাস নানাভাবে ভাক্ত-সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবার বাসনা যে-হৃদয়ে বসতি লাভ করে নাই— শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের পদধূলি-পদজলে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষ যে-হৃদয়ে অভ্যুদিত হয় না, সেই হৃদয় সকল-কুহক, সকল-ক্লেদ ও সকল কৈতবময় এক অন্ধ-কন্দরমাত্র। সে-স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কেবল অন্তর্দ্ধানলীলা কেন, আবির্ভাবাদি কোন লীলারই রহস্য উন্মোচিত হইতে পারে না। সূর্য্যদর্শন করিবেন না বলিয়া যাহারা তাম্র হস্তে লইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, দিবালোকের মহিমা তাহাদের নিকট যে চিররহস্যাবৃতই থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তালোকে অজ্ঞানান্ধতা বিদূরিত করিবার সামান্যতম ইচ্ছাও যাহারা পোষণ করেন না, শ্রীচৈতন্যানুচর-গণের প্রতি প্রপন্ন হইবার

যোগ্যতা যাহাদের কিছুমাত্র নাই—তাহারা অপহৃত চৈতন্য। সেই অপহৃত চৈতন্যসকল স্বকপোলকল্পিত যথেচ্ছ লেখনীর দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রাকৃত অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গকে যে-প্রকারে জনসমক্ষে পরিবেশন করিতেছেন, তাহা কেবল নিন্দনীয়ই নহে, জামিনের অযোগ্য অপরাধও। তাহাদের সেই ক্রূর কল্পনা-জালে আবদ্ধ হইয়া কত শত কোমলচিত্ত চিরকালের জন্যই অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে। পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ তাঁহাদের এই পাতিত্য বরণের যোগ্যতা দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন,—"**আমাদেরই দোষ—আমরা অনুক্ষণ দ্বারে দ্বারে এইসকল কথা প্রচার করে দু'চার গ্যালন রক্ত খরচ করতে নারাজ হই—রক্তগুলিকে রেখে দেই ভোগ বা ত্যাগ করবার জন্য।**" (সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ, ১২শ খণ্ড ৪৮শ সংখ্যা)।

এ যাবৎ সেইসকল পাষণ্ড-প্রজল্পের প্রতিবাদে বহু সভা-সমিতি আয়োজিত ও বিভিন্ন সাময়িকীতে ইতঃস্তত নানা লেখনীপ্রসূত সাবধানবাণী প্রকাশিত হইলেও অদ্যাবধি পৃথক্ গ্রন্থাকারে কোন সঠিক প্রকাশন ঘটে নাই। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ"-নামক এই পুস্তিকা বিলম্বে হইলেও সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবে সন্দেহ নাই। মোট ছয়টী 'প্রসঙ্গ'-অঙ্গীভূত বর্ত্তমান গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রজল্প স্তম্ভনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে অপপ্রচারের পশ্চাতে যে-সকল দূরভিসন্ধি, অপপ্রচারকদের স্বরূপ, 'অবতার'-নামে যত বেলেল্লাপনা, তাহাদের কল্পিত কাহিনীর খণ্ডন প্রভৃতি উদ্ঘাটনমুখে ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব-তত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের 'ভাবুকতা' লইয়া বিভিন্নভাবে যে-সকল কটাক্ষ, তাহা নিরাস করা হইয়াছে। এইসকল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে অবশ্যপ্রকাশ্য আরও কিছু তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তি হস্তগত হইলে পরবর্ত্তী প্রকাশনায় তাহা প্রকাশ করা হইবে। এই বিষয়ে সুধী পাঠকবৃন্দ প্রকাশকের সহিত যোগাযোগ করিলে তাহা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা হইবে। গ্রন্থের কলেবর যাহাতে অযথা বৃদ্ধি পাইয়া গ্রন্থপাঠে অনভ্যস্ত সাধারণ জনগণের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটায় এবং ভাষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য হয়—তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।



আধুনিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের 'জয়ানন্দ' শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ অনুকরণদ্বারা ও (উৎকল-প্রদেশের) কোন এক 'মাধব পট্টনায়ক' মহাপ্রভুর প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের ছল উঠাইয়া যে উৎপাত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা সৎগবেষকমাত্রই ধরিতে পারেন। তবে তৎসঙ্গে মনে হয় তাঁহাদের জানা উচিত ছিল—যে-শ্রীচৈতন্য- দেবের সম্বন্ধে ঐরূপ অশ্রাব্য পাষণ্ড-সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে, সেই শ্রীচৈতন্যদেবই সনাতন-শিক্ষাচ্ছলে জগজ্জীবকে জানাইয়াছিলেন—

"**মৌষল-লীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।**
**কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান॥**
**মহিষী-হরণ আদি সব—মায়াময়।**"

সুতরাং স্বয়ং মহাপ্রভুর বাক্যেও তাঁহার অপ্রকট-লীলার তাৎপর্য্য আমরা জানিতে পারি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীভগবানের কোন প্রাকৃতিক কারণবশতঃ জগৎ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতে পারে না—স্বেচ্ছাময়ের নিরঙ্কুশ ইচ্ছায়ই তাঁহার অপ্রকট লীলাপ্রকাশ হইয়া থাকে।

মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলাকে কেন্দ্র করিয়া এই জগতের অনেক রায়বাহাদুর, অনেক 'ডি-লিট্' প্রভৃতি তাঁহাদের জড় বিচারের অভিজ্ঞানে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাকেই একটী বাহাদুরির বিষয় জ্ঞান করিয়া সেইসকল পরবিদ্যা-পরাঙ্মুখগণ তাঁহাদের বহু গবেষণার ফলরূপে যে-সকল অত্যন্ত গ্রাম্যকথা পরিবেশন করেন—তাহা শুনিয়া বৈষ্ণব-গৃহের নিরক্ষর ভৃত্যও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ, দেহ-দেহী-অভিন্ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মায়ানির্ম্মিত পাঞ্চভৌতিক শরীর জম্বুদ্বীপের মাটিতে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠযাত্রার বর্ণনা যে কি-প্রকার তত্ত্ববিরোধপূর্ণ, তাহা তত্ত্বান্ধগণ কিরূপে বুঝিবে? মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু এক প্রাকৃত বঙ্গদেশীয় কবিকে কঠোর শাসনদ্বারা ভগবানের দেহ-দেহী অভিন্নতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সকল শাসনবাণীর ধার না ধারিয়া সেই শিক্ষিতাভিমানিগণ ভগবানের লীলা-তাৎপর্য্য- অনুধাবনের কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহার 'লীলাবসানের' প্রতিই অযথা অত্যুৎসাহী হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'লীলাবসান কথাটী' হয় না। লীলা ও ক্রিয়ায় ভেদ আছে।

ক্রিয়া—অনিত্যা, কিন্তু লীলা—নিত্যা। ক্রিয়ার অবসান আছে, লীলার অবসান নাই। বদ্ধজীবের নিকট লীলার যে সঙ্গোপন দৃষ্ট হয়, তাহা অবসান নহে। অবসান অর্থে—পরিসমাপ্তি। লীলা—অলাতচক্রবৎ নিত্যা। ক্রিয়ায় কর্ত্তার কর্ম্মফলবাধ্যতা আছে, কিন্তু লীলা কর্ত্তার সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা ও স্বতন্ত্রতা-প্রসূত। সুতরাং যাহা স্বতন্ত্রতা-প্রসূত, তাহাকে যে সর্ব্বদা সাধারণ জাগতিক বিধিবাধ্যই হইতে হইবে, ইহা কোন সুযুক্তিবাদীই স্বীকার করেন না।

কেহ কেহ আবার 'শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধান' বিষয়ে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লে'র ভূমিকায় মনোধর্ম্মোত্থ নানা প্রজল্প প্রকাশমুখে বস্তুতঃ তাহাদের শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞান-সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞানতারই প্রচার করেন মাত্র। তাঁহারা যতই না কেন মহাপ্রভুর সম্বন্ধে গীতার '**অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**" প্রমাণ উল্লেখ করুন, পরিশেষে কিন্তু মহাপ্রভুর সমাধিস্থান-আবিষ্কারের ব্যস্ততায় তাঁহাদের দুরভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'তিরোধানের' অর্থ জানিলে ভগবানের সমাধিস্থান আবিষ্কারের দুরাগ্রহ থাকে কি? এইপ্রকার 'অর্দ্ধকুক্কুটী' বিচারপর হইয়া তাঁহারা চৈতন্যদেবের সমাধিস্থান লইয়া পরস্পর বিতর্কে রত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা 'একই গোয়ালের গরু'—অশ্বঘোষীয় জয়ানন্দের পদাবলেহী তাঁবেদার। যাঁহার যে কোন স্মৃতি-চিহ্ন, যাঁহার উপবেশন ও বিবরণ স্থানগুলি এক একটী মহাতীর্থের উদ্ভব করাইয়াছে, আজ যদি সত্য সত্যই সেই শ্রীচৈতন্যদেবের সমাধি-স্থান থাকিত, তাহা হইলে সেই স্থান লোকের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত অপরিজ্ঞাত স্থানরূপে অবস্থিত থাকিয়া প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পর নূতন করিয়া গবেষণার জন্য নিশ্চয়ই পড়িয়া থাকিত না।

শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে মনোরথীদের এই প্রকার বিভিন্ন অনাসৃষ্টির কারণ এই যে, অপ্রাকৃত বস্তু-বিষয়ে একমাত্র মূল প্রমাণ যে শ্রৌতসিদ্ধান্ত, তাহা তাঁহাদের ভোগময়ী ধারণার তর্পণ বিধান করিতে পারে না। মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভজন করেন বা যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গুরুর কৃপায় ভক্তিস্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা কখনই ঐরূপ আরোহবাদের প্রণালী লইয়া অভিযান করেন না। ঐরূপ অহমিকাময়ী সাধন-প্রণালী গুরুপাদপদ্ম-বিচ্যুত মনোধর্ম্মিগণের একপ্রকার চেষ্টা



হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব বা সাধক নহেন এবং মহাপ্রভুর পার্ষদগণও বিভিন্নাংশগত কোন সাধক জীব নহেন—শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায়ই তাঁহাদের জগতে অবতরণ। সকলপ্রকার মনোধর্ম্মের জঞ্জালকে জলাঞ্জলি দিয়া সেই তাঁহাদের অনুগমন করিবার সুপ্রবৃত্তি উদয় হইলেই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রকাশিত অনর্পিতচর বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য্য-প্রাচুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। "**শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥**" —শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর এই বাক্য উপেক্ষা করিয়া আমাদের জাগতিক 'বড়'র অভিমানে অতিমর্ত্ত্য বিষয়-সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার অধিকার কতটা আছে তা সর্ব্বাগ্রে বিচার করিয়া দেখাই অধিকতর বুদ্ধিমত্তা। অলমতি বিস্তরেণ।

**শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি**
৩০ গোবিন্দ, ৫১২ গৌরাব্দ

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
**শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন**

# নিবেদন

"জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন। ত্রিভুবন করে যার চরণ-বন্দন॥"—এহেন সর্ব্বভুবন-বন্দ্য সর্ব্বপরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই বাংলা ও উড়িষ্যার কতিপয় হতভাগ্য লোক কিছু অপপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আসুর-শ্রেণীভুক্ত। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানাইয়াছেন —"**দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।**" (১৬।৬)—অর্থাৎ, এই জগতে দেব-স্বভাব ও আসুর-স্বভাব, এই দুইপ্রকার জীব-সৃষ্টি দেখা যায়। আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণের ইহাই কার্য্য—ভগবৎতত্ত্বকে অস্বীকার করা। তাহারা মহাপ্রভুকে এক সাধারণ মনুষ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া ও তাঁহার অপমৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহে? ইহাতে কি তাহারা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী স্তব্ধ করিতে সমর্থ হইতে পারে? যে-ই সেই প্রেমধর্ম্মের বাণী একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই সেই বাণীর প্রতি, বাণী-বীণাধরের প্রতি নতমস্তক হইয়া পড়েন। শাস্ত্র-বুদ্ধি না থাকিলেও সাধারণ-বুদ্ধির দ্বারাই তাহারা বুঝিতে পারেন, এত বড় মাপের কথা যিনি জগতে বিতরণ করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই, করিতে পারেন নাই, তিনি নিশ্চয়ই কোন সাধারণ বা অসাধারণ মনুষ্য হইতে পারেন না—তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্। আর শাস্ত্র-আলোচনা থাকিলে ত' কথাই নাই।

এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অপপ্রচার-কারীদের স্বরূপ, দুরভিসন্ধি প্রভৃতি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটনা প্রকৃতপক্ষে কি-প্রকার, তাহাও জানা যাইবে। কোমল-শ্রদ্ধালুগণ যাহাতে অপপ্রচার-দ্বারা প্রভাবিত না হন, ভগবৎতত্ত্বে অপরাধ না করিয়া বসেন, তজ্জন্যই এই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক।

**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**
১৬ বামন, ৫২৯ গৌরাব্দ

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-দাসানুদাস
**শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক**



# বিষয়-সূচী


**প্রথম প্রসঙ্গ অচৈতন্যের শ্রীচৈতন্য-বিরোধ** পৃষ্ঠা—১-১০

ভগবদ্বিমুখতা অপেক্ষা ভগবদ্বিরোধিতা অধিক ভয়াবহ ১
পাষণ্ডদের ঘৃণ্য প্রয়াস ২
পাষণ্ডদের প্রতি উপেক্ষা-নীতিই অবলম্বনীয় ২
শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার মুখ্য কারণ ৩

**দ্বিতীয় প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব এবং অবতারবাদ** পৃষ্ঠা—১১-২৭

আজকালকার শাস্ত্রছাড়া অবতার ১১
'অবতার' কাকে বলে ১২
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া 'অবতার'-রূপে মেনে নেওয়া অন্যায় ১৫
শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা-শাস্ত্র-প্রমাণিত ১৮
শ্রীচৈতন্যোত্তরকালে চৈতন্য-বিরোধী যত কলির অবতার ২২
মহাপ্রভুর কথিত 'দুই অবতার' রহস্য ২৩
শ্রীচৈতন্যদেবের পর শ্রীকল্কি-অবতারেরই প্রসঙ্গ ২৬

**তৃতীয় প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-শাস্ত্র এবং নারকী রচনাবলী** পৃষ্ঠা—২৮-৫৩

কোন্‌টী আলোচনীয়—শাস্ত্র, না অশাস্ত্র? ২৮
শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীচৈতন্য-বিরোধীগণ ২৯
শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের রচনা সকলই 'শাস্ত্র' ৩৪
শ্রীচৈতন্য লীলার মূল প্রামাণিক গ্রন্থাবলী ৩৬
জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ৪০
শ্রীলোচন-দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' ৪৩
শ্রীমাধব পট্টনায়কের নামে জাল-রচনা ৪৫

**চতুর্থ প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে অপবাদ ও তার খণ্ডন** পৃষ্ঠা—৫৪-৮৯

প্রথম অপবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব বিষক্রিয়ায় মৃত্যুকবলিত ৫৪
অপ্রাকৃত ভগবদঙ্গে বিষক্রিয়া অসম্ভব ৫৪
"পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত" ৫৮
মহাপ্রভুর অঙ্গস্পর্শেই কুষ্ঠাদির নাশ, সেস্থলে বিষক্রিয়া! ৫৯
মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে আধুনিকতম গল্প ৬০
দ্বিতীয় অপবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব পাণ্ডাগণের দ্বারা নিহত ৭১
বিভু আত্মা ভগবান্ কখনই হননীয় নন ৭১
ভগবানের বিরুদ্ধে আসুরিক বৃত্তির কোনপ্রকার ফলপ্রসূতা নাই ৭৪
মহাপ্রভুর প্রতি বৌদ্ধাচার্য্য ও ভট্টথারিদের নিষ্ফল আক্রমণ ৭৫
সমুদ্র-নিমজ্জিত মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিমত্তার প্রকাশ ৭৬
মহাপ্রভু এবং নীলাচলবাসিগণ ৭৮
মহাপ্রভু এবং উৎকল রাজা ৮২
উৎকল-রাজের তীব্র বিরহই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রমাণ ৮৩
মহাপ্রভুর সমাধিস্থল নিয়ে পাষণ্ডদের ঘণ্য মত ও মতানৈক্য ৮৫
শ্রীপুরীধাম এবং সমগ্র উড়িষ্যা-রাজ্যে অমলিন শ্রীচৈতন্যপ্রভাব ৮৭

**পঞ্চম-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান** পৃষ্ঠা—৯০-১০৩

ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব ৯০
মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের সূচনা ৯৪
দিব্যোন্মাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'গোপীনাথে' প্রবেশ ৯৬
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কাল ৯৮
মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে আরও দুটী বিচার ১০০
ভগবানের ভগবত্তা-অনুভবই মানবের বিমুক্তি ১০২

**ষষ্ঠ প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য-ভাব বনাম অচৈতন্য-যুক্তি** পৃষ্ঠা—১০৪-১১৭

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ

## প্রথম প্রসঙ্গ

## অচৈতন্যের শ্রীচৈতন্য-বিরোধ

### ভগবদ্বিমুখতা অপেক্ষা ভগবদ্বিরোধিতা অধিক ভয়াবহ

'ভবব্যাধি' বলে একটী কথা আছে। কিন্তু তার পরিচয় আমরা বিশেষ জানি না। ব্যাধিগ্রস্ত হয়েও সেই ব্যাধি-সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অত্যন্ত ভয়াবহ। এক কথায়, ভগবদ্বিমুখতাই সেই 'ভবব্যাধি'। সেই ভবব্যাধির ফল—আমাদের এই দারুণ সংসারগতি [১]—ত্রিতাপে ভরা দুর্ব্বিষহ সংসারচক্র। জেলখানায় কয়েদীরা কি আর হাসে না? হাসে, তবে সেই হাসিরই বা কি মূল্য? জগতে দুঃখ-সাগরের মাঝে যে কখনও কখনও সুখের বুদ্বুদ্ দেখা যায়—তা পরক্ষণে আর এক দুঃখেই পরিণত হয়। সংসারঘুঘু আমাদের কাছে নিশ্চয়ই এসব এত বিস্তৃত করে বলার দরকার হয় না।

কিন্তু ভগবদ্বিরোধিতার ফল আরও মারাত্মক। অজ্ঞতা থেকে ভগবদ্-বিমুখতা আর আসুরিকতা থেকে ভগবদ্বিরোধিতা। উভয়ের অবস্থা এবং গতি কিন্তু এক নয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জানিয়েছেন এই ভগদ্বিরোধিতার ফল,—"আমি সেই বিদ্বেষী ক্রূর নরাধমগুলিকে এই সংসার-মধ্যেই বর্ত্তমান অশুভ আসুর-যোনিগুলিতে নিক্ষেপ করি। তখন আমাকে লাভ করা তাদের পক্ষে আরও অসম্ভব হয়ে পড়ে, ফলে ক্রমশঃ তারা অধম থেকে আরও অধম গতি লাভ করতে থাকে (গীঃ ১৬।১৯-২০)।"[২]—অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ

---

১। কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
(চৈঃ চঃ ২।২০।১১৭)

২। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরী যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

ব্যক্তিরও কোন সুকৃতিবশতঃ কখনও ভগবানে মতি লাভ হতে পারে, কিন্তু বিদ্বেষবশতঃ ভগবদ্বিরোধীদের একবার আসুরযোনিতে গতি হলে তাদের পক্ষে ভগবৎপ্রাপ্তি তখন নিতান্তই কঠিন হয়ে পড়ে। তখন 'ধর্ম্মের কথা, সুযুক্তির কথা কিছুতেই শুনব না, না, না'—এইপ্রকার গোঁয়ার্ত্তুমি তাদেরকে এমন পেয়ে বসে, যা ষণ্ডের (ষাঁড়ের) স্বভাবকেও অতিক্রম করে। এইরূপ পাপের 'ষণ্ড' অর্থাৎ চিহ্ন-ধারণের নামই পাষণ্ডতা।

## পাষণ্ডদের ঘৃণ্য প্রয়াস

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভগবত্তায় অবিশ্বাসী একদল পাষণ্ড সমগ্র বিশ্বকে অচৈতন্যে নিমগ্ন করাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক লীলাসকলকে বিকৃত করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। তাঁরা মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত অন্তর্দ্ধান-লীলাকে অত্যন্ত-ঘৃণ্যরূপে জনসমক্ষে প্রতিপাদন করছেন। তাঁরা মনে করেন—পৃথিবীর সব বিষয়েই তাঁদের নাক গলানোর অধিকার হয়েছে। বিশেষ করে ধর্ম্মবিষয়ে ত' কথাই নেই। একে অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে আগ্রহী হওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক এবং হাস্যকরও। সকলের পক্ষে সকল কাজ নিশ্চয়ই শোভনীয় নয়। যে-বিষয়ে কোন গভীর প্রবেশ নেই, এমনকি নেই সাধারণ শ্রদ্ধাটুকু, সে-বিষয়ে কলম নিয়ে খামখেয়ালিপনা কতখানি অনধিকার চর্চ্চা! কথায় আছে—"Devils can quote scriptures." শয়তানের যে শাস্ত্রালোচনা, তার মূলে আছে হিংসাবৃত্তিই। শাস্ত্র-বিচার নিজ জীবনে গ্রহণ করবার কোন মতলবই তাঁদের নেই। সেক্ষেত্রে যে সমালোচনা, তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত-ভাবে অপপ্রচার ছাড়া আর কি?

## পাষণ্ডদের প্রতি উপেক্ষা নীতিই অবলম্বনীয়

'*নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।*' ইতর-সমাজের অভদ্র-আচরণে ভদ্রশ্রেণীর লোক স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে পরিহার করে চলতে চান। আর এতে ইতরগুলো পেয়ে বসে, ভাবে—ভদ্রলোকেরা দুর্ব্বল, গায়ে জোর নেই। ভণ্ডপণ্ডিতের ভণ্ডামিতে আসল পণ্ডিত তিতিবিরক্ত হয়ে সভা



ত্যাগ করলে একদঙ্গল মূর্খ শ্রোতা তাদের ভণ্ড প্রতিনিধিকে মাথায় নিয়ে নাচতে থাকে, আনন্দে বগল বাজাতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে সুবুদ্ধি না হেসেই বা কি করবেন? বর্ষাকালে ব্যাঙের দলই যেখানে বক্তা, সেখানে কোকিলের মৌন থাকাই শোভনীয় নয় কি?

**"ভদ্রং কৃতং কৃতং মন্যে কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।**
**দুর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥"**

নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা সহজ, কিন্তু অনিদ্রিতের ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত এইপ্রকার ব্যক্তিকে উপেক্ষা করতেন বলেছেন। এইজন্যই সুবুদ্ধিগণ সযত্নে পাষণ্ডদেরকে পরিহার করেই চলেন। এইসকল দ্বেষিগণের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দণ্ডদাতা শ্রীযমদেবের উপরই ভগবান্ অর্পণ করে রেখেছেন। ভগবানের ভক্তগণ এই কারণে যমদণ্ড্য সেই পাষণ্ডদের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। ভগবানের প্রতি প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সাথে মৈত্রী, ভগবৎ-তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞদের উপর কৃপা আর ভগবদ্-বিদ্বেষীদের সম্বন্ধে উপেক্ষা—এইটীই ভগবদ্ভক্তের জীবন-চরিত্র। পাষণ্ডরা একে মহা অজ্ঞ, তার উপর বিদ্বেষী,—তাই তারা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা জিজ্ঞাসু নয়, কারণ, পণ্ডিত-অভিমানী। তাদের প্রশ্নে প্রণিপাত নেই, আছে কেবল মেপে নেবার ধৃষ্টতা। সুতরাং এরা কেবল যে সংশোধনের অযোগ্য, তাই নয়, পরন্তু উপেক্ষার পাত্র। তাই পাষণ্ড-গুলির চীৎকারে ভগবদ্ভক্তগণের যে বধির হবার অভিনয়, তা তাঁদের কোন দুর্ব্বলতা নয়—অসম্ভাষ্য-জ্ঞানে উপেক্ষা।

## শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার মুখ্য কারণ

শ্রীচৈতন্য-বিরোধীগোষ্ঠী মাৎসর্য্যে অধীর হয়ে যে-সকল তথ্য সংকলন ক'রে থাকেন, তাতে যে সামান্যতম প্রামাণিকতা কিংবা ভিত্তি নেই, তা একটু মাটী খুঁদলেই দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধিতায় আদা-জল-নুন খেয়ে লেগে থাকা এ সকল তথাকথিত উচ্চবিদ্যা-কুলসম্পন্ন ভদ্রলোকদের হাঁড়ির খবর যদি নেওয়া যায়, তবে দেখা যাবে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বিচারে এঁদের কোন না কোনভাবে আঁতে ঘা লেগেছে—তাঁদের নিজ নিজ অন্যায়

Ego, ism, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে। তারই কিছু দিগ্‌দর্শন মাত্র নীচে উল্লিখিত হল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের ভগবদ্ভক্তি-বিরোধী স্মার্ত্তাচারকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। স্মৃতিশাস্ত্রের যাবৎ গৌণ-উপদেশের বহুমাননকারী এইসকল স্মার্ত্তগোষ্ঠী নিজ নিজ অপস্বার্থ চরিতার্থ কর্‌বার জন্য শাস্ত্রের মুখ্য উপদেশগুলিকে কোনক্রমেই লোকগোচর করেন না। ''*মাকড় মারলে ধোকড় হয়*''✶—এইপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা প্রদানকারী স্মার্ত্ত-গোষ্ঠীকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কখনও আদর করেননি। মহাপ্রভুর সময়কালীন সুবুদ্ধি-রায়ের কথাই ধরা যাক্। বঙ্গের তৎকালীন বাদ্‌শাহ হুসেন শাহ স্ত্রীর প্ররোচনায় করোয়ার জল বলপূর্ব্বক পান করিয়ে সুবুদ্ধিকে যখন জাতিভ্রষ্ট করলেন, তখন তিনি কাশীতে গিয়ে স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের কাছে প্রায়শ্চিত্ত-বিধান প্রার্থনা করলেন। তাঁরা সুবুদ্ধিকে তপ্ত ঘি পান করে শোধিত হবার বিধান দিলেন। সুবুদ্ধি রায় প্রাণনাশ-কারক সেই কুবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে কাশীতে সেকালে ঘটনাক্রমে উপস্থিত সকল সুবুদ্ধি-গণের আরাধ্য সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে সর্ব্বমহৌষধ ও সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত 'শ্রীহরিনাম' নিষ্কপটে গ্রহণ করতে বললেন। নামের আভাসেই সমস্তপ্রকার পাপ বিদূরিত হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি দৈহিক দণ্ডের দ্বারা কখনই অন্তরের শোধন হয় না। (জনশ্রুতি আছে যে, পরবর্ত্তিকালে সেই কাশীবাসী পণ্ডিতগণ হরিনামাশ্রয়ে সুবুদ্ধির পাপমোচন হয়েছে কিনা, তা যখন হাতে-নাতে প্রমাণ পেতে চাইলেন, তখন সুবুদ্ধি সেই পণ্ডিতগণেরই প্রস্তাবিত পরীক্ষা-অনুসারে কাশীর শ্রীবিশ্বনাথের বাহন বৃষ-মূর্ত্তির মুখের কাছে কোমল ঘাস তুলে ধরেছিলেন। সকলকে স্তম্ভিত

✶ কোনসময় একটা মাকড়সা বধ করে অনুতপ্ত এক তন্তুবায় কোন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলে, পণ্ডিত মহাশয় তাঁকে প্রাণিবধ-জনিত প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। তন্তুবায়ও সেই বিধান যথারীতি পালন করলেন। একদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই পুত্র তন্তুবায়ের সামনে একটা মাকড়সা মারলে তন্তুবায় তখনই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তা জানালেন। ভট্টাচার্য্য বাবু উত্তরে হাসতে হাসতে বললেন,—'তাতে আর কি হয়? মাকড় মারলে ধোকড় (বস্ত্র) হয়। অর্থাৎ আরও কাপড়-চোপড় লাভ হয়।



করে ঐ বৃষমূর্ত্তি সুবুদ্ধির নিকট থেকে সেই তৃণ গ্রহণ করেছিলেন। হরিনামাশ্রয়েই সকল পাপ অনায়াসেই দূরীভূত হয়—পৃথক্ ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই—বৃষরাজ তা কাশীবাসী সেই পণ্ডিতের কাছে প্রমাণ করলেন।) এইপ্রকারে বিভিন্ন বিচারে শ্রীচৈতন্যদেব স্মার্ত্ত-ব্যবস্থাকে নিরাশ করেছিলেন। তাতে স্মার্ত্তগোষ্ঠী মহাপ্রভুর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন।

স্মার্ত্তজড় ব্রাহ্মণ-সমাজ ও তৎপদাবলেহী অজ্ঞ-গোষ্ঠী নিজ নিজ কামনা চরিতার্থ কর্‌বার জন্য বহু-ঈশ্বরবাদ তথা পঞ্চোপাসনাকেই বহুমানন করেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি-রূপে ঘোষণা করে সবাইকে সেই শ্রীমদ্ভাগবতীয় বিচারেই উদ্বুদ্ধ করেছেন—

> ''**একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।**
> **যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥**'' (চৈঃ চঃ ১।৫।১৪২)
> ''**জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।**
> **পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥**'' (চৈঃ ভাঃ ২।১।১০২)

অন্যান্য দেবতার উপাসনা ও শ্রীহরির উপাসনাকে সমান জ্ঞান করা বিশেষ অপরাধ। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলে যেমন সেই বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, উপশাখা, পত্র, ফুল, ফল সকলেই সতেজ হয়, তেমনই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীগোবিন্দের ভজনায় তাঁরই বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ যাবৎ দেবতাগণেরও অর্চ্চন হয়ে থাকে।[৩] কেবল শ্রীমদ্ভাগবতই নয়, পদ্মপুরাণেও দেখাযায়—''পরমসেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করে যাঁরা অন্য দেবদেবীর উপাসনা-দ্বারাই সংসার উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছা করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কুকুরের লেজ ধ'রে সমুদ্র অতিক্রমের দুর্ব্বাসনা পোষণ করেন।''[৪] স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শ্রীমুখবাণীতেই এ সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন—''যাঁরা অন্যান্য দেবতাগণকে অবিদ্যা-বশে

৩। ''যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥''—(ভাঃ ৪।৩১।১৪)।

৪। ''যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্। তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্॥—(পাদ্মে)

আমার সাথে সমান জ্ঞান ক'রে দেবতা-পূজা করেন, তাঁরা পরোক্ষ-ভাবে আমাকেই অর্থাৎ আমারই নানা বৈভব-রূপগুলিকে পূজা করেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা সেই দেবতাগণকে আমার থেকে স্বতন্ত্র এবং সমান জ্ঞান করেন; সেহেতু তাঁদের সেই সমস্ত পূজা অবিধিপূর্ব্বক হয়ে থাকে (গীঃ ৯।২৩)। সুতরাং ফললাভও হয় তথৈবচ—সেই দেবপূজকগণ অনিত্য দেবতা-লোকে গমন করেন; মূলপিতা আমাকে অবজ্ঞা ক'রে শৌক্রজন্ম-সূত্রে পিতৃগণকেই যাঁরা বহুমানন করেন, তাঁরা অনিত্য পিতৃলোকে গতি লাভ করেন; 'জীব-পূজা করলে ভগবানেরই পূজা হয়'—এই জ্ঞানে আমার পূজা পরিহার ক'রে ভূত-পূজাতেই যাঁরা মগ্ন থাকেন, তাঁরা সেই ভূতলোকই প্রাপ্ত হন; আর যাঁরা নিত্য চিৎতত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন (গীঃ ৯।২৫)। (অর্থাৎ 'যেমন কর্ম্ম তেমন ফল'—সকলের একই গতি কখনই হয় না।) আর ব্রহ্মলোক থেকে আরম্ভ ক'রে যে কোন লোকেই গমন হোক্ না কেন, পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী—কেবল আমাকে লাভ করলেই জীবের পুনর্জ্জন্ম আর হয় না (গীঃ ৮।১৬)। এইপ্রকারে শাস্ত্রীয় নিগূঢ় বিচার সব তুলে ধরলে পঞ্চোপাসকীগণ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা হারানোর ভয়ে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ বিশেষ দুরভিসন্ধি-বশে সাধারণ অজ্ঞ সমাজকে শাস্ত্র-আলোচনা থেকে দূরে রাখতেন। অনধিকারীরই কেবল শাস্ত্র-আলোচনা নিষেধ—এটীই শাস্ত্রীয় নিষেধনামার তাৎপর্য্য। জন্মসূত্রে কেবল একটী বিশেষ গোষ্ঠীরই তা আলোচনীয় এবং অন্যান্যের পক্ষে তা স্পর্শের ঊর্দ্ধে—এটী কখনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। নতুবা অসুরকুলে জাত শ্রীপ্রহ্লাদ কিরূপে শাস্ত্র-উপদেশ করেন, অথবা অবর-কুলোদ্ভূত শ্রীসূত গোস্বামীকেই বা কিরূপে শৌনকাদি মুনিগণ শাস্ত্র-উপদেশক-রূপে বরণ করেন, অথবা 'শূদ্র'-রূপে কথিত বিদুরের সাথেই বা কি-প্রকারে মহর্ষি মৈত্রেয় শাস্ত্রালোচনায় আগ্রহী হন, কিংবা গর্গমুনির কন্যা গার্গীই বা কিরূপে জনকরাজের সভায় সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্রালোচনায় সাহস করেন। আসলে শাস্ত্রের নিরপেক্ষ বিচার



প্রচারিত হয়ে পড়লে তথাকথিত ব্রাহ্মণ-সমাজের একচ্ছত্র সামাজিক প্রতিপত্তি ও সেই অনুসারে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিপর্য্যয় আসতে বাধ্য। আর, শাস্ত্রীয় বিচারে 'শূদ্র' কাকে বলা হয়? পদ্মপুরাণ বলছেন—'জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকলে যিনিই হন না কেন, তিনি 'শূদ্র' বলেই গণনীয়। আর সেই ভগবানের প্রতি যাঁর অচলা ভক্তি, তাঁকে পুনরায় কখনও 'শূদ্র' বলা যায় না—'ভাগবত'-রূপেই তাঁর সম্মান।[৫] বিষ্ণুভক্তি-হীন ব্রাহ্মণ শ্বপচ অপেক্ষাও অধম—সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ।[৬] আর 'বরাহপুরাণ' ত' কলিযুগের সেই বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণগণকে রাক্ষস[৭]-রূপে ঘোষণা ক'রে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছেন। 'ব্রহ্মতত্ত্ব'-বিষয়ে অনভিজ্ঞ অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলেই গর্ব্বিত তথাকথিত সেই ব্রাহ্মণগণকে অত্রিঋষি 'পশু' বলেই পরিচয় প্রদান করেছেন।[৮] ডাক্তারের সন্তান যে ডাক্তার হবেনই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, তেমনই ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্রাহ্মণোচিত গুণবর্জ্জিত হলে ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত হন না, আবার শূদ্রে বিপ্রলক্ষণ দেখা গেলে তিনিও শূদ্র-বাচ্য হন না।[৯] শাস্ত্রের এইসকল অকৈতব কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু অকপটে সর্ব্বসমক্ষে উন্মোচন করে দিয়েছেন—

**''কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।**
**যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥''** (চৈঃ চঃ ২।৮।১২৮)

আর এতেই তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের রোষানল জ্বলিত হয়ে উঠল।

---

৫। ''ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতামতাঃ। সর্ব্ব বর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

৬। ''শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যে যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥ —(নারদীয় পুরাণ)

৭। ''রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু। উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রীয়ান্ কৃশান্॥''—(বরাহ পুরাণ)

৮। ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥—(অত্রিসংহিতা)

৯। শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥—(মহাভারত)

আবার দেখুন—'দরিদ্র-নারায়ণের কথা'—কতখানি অসিদ্ধান্তপর! নারায়ণের দারিদ্র্য!—এ যে সোনার পাথরবাটী! ভগবান্-শব্দের অর্থই যিনি পূর্ণরূপে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী[১০]—সেখানে তাঁর দারিদ্র্য! কোথায় কর্ম্মফলবাধ্য আমরা জীব—আর কোথায় কর্ম্মফল-প্রদাতা ঈশ্বর! অহো বস্তু-জ্ঞানের কি-প্রকার অভাব! শ্রীমহাপ্রভু সেই অজ্ঞতা অপসারণ করতেই বললেন,—

"**ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।**
**হেন শক্তি নাহি মান—পরম সাহস!!**
**'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।**
**হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ!!**" (চৈঃ চঃ ২।৬।১৬১-১৬২)

'জীব-শিব' মতবাদও তথৈবচ। সাধারণ মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ এইসকল কুপ্রচলিত বাক্যের মধ্যে অপসিদ্ধান্ত একটুও লক্ষ্য করে না। শিবশক্তি পার্ব্বতী বদ্ধজীবের কাছে 'মা', আর মুক্ত হয়ে গেলে সেই জীব কিনা স্বয়ং 'শিবঠাকুর' বনে যান এবং সেই 'মা' কিনা তখন হয়ে পড়েন 'বামা' অর্থাৎ ভোগ্যা! "*পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ!*"—এইপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্তদের হাত থেকে বাঁচতেই বুঝি 'মা' তাদের মুণ্ডপাত ক'রে সেই মুণ্ডমালা ধারণ করেন। প্রজা যেমন নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলে তাতে রাজার প্রতি অবজ্ঞা বা রাজ-দ্রোহিতাই প্রদর্শন করা হয়, তেমনই জীব নিজকে 'শিব' বলে পরিচয় দিলে শিবতত্ত্বকে অমান্য ও শিবদ্রোহিতাই করা হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীশম্ভু বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ—"**বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু**" (ভাঃ ১২।১৩।১৬)। তিনি সর্ব্বজীবের গুরু—তাঁর আনুগত্যেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে।

"**শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।**
**শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে?**
**মোর প্রিয় শিব-প্রতি অনাদর যার।**
**কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥**" (চৈঃভাঃ ৩।৪।৪৮০-৪৮১)

১০। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ (বিষ্ণুপুরাণ)। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ৬টী অচিন্ত্যগুণ যাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তিনিই ভগবান্।



শ্রীশম্ভু সেই নারদাদি পরমমুক্তগণেরও গুরু—সুতরাং জীব মুক্ত হলেও শ্রীশম্ভু গুরুরূপেই নিত্যপূজিত হয়ে থাকেন। জীবকে কখনও 'নারায়ণ', কখনও 'শিব' ইত্যাদি মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করার যে কু-রীতি—তাতে ভগবৎ-তত্ত্বের সাথে দ্রোহাচরণই শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে জীবের পরিচয় প্রদান করেছেন—"**মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ**"—(গীঃ ১৫।৭)। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণেরই অংশবিশেষ; সুতরাং বিষ্ণুর সাথে সম্বন্ধিত বলে জীবমাত্রই 'বৈষ্ণব'[১১]—এটীই তাঁর পরিচয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তা' আরও স্পষ্ট ক'রে বললেন—

"**জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।**
**কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ॥**"(চৈঃ চঃ ২।১০।১০৮)

এইপ্রকারে বিভিন্ন চটুল ও মুখরোচক অসিদ্ধান্তপর কথার রাশ টেনে ধরায় তা অনেকেরই কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল।

'ঈশ্বর-আজ্ঞা' শিরোধার্য্য ক'রে শ্রীশম্ভুই 'শঙ্করাচার্য্য' রূপে জগতে প্রকটিত হয়ে অসুর বিমোহনের জন্য 'মায়াবাদ'-নামে অসৎশাস্ত্র প্রচার করেছিলেন।[১২] সুতরাং "জগৎ মিথ্যা এবং জীবই ব্রহ্ম"—প্রভৃতি যে-সকল কথা শঙ্করাচার্য্য প্রচার করেছিলেন, তা নিজ-কল্পনাপর কথা। অতএব প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীগণের পক্ষে তা শ্রবণ বা আলোচনা করা উচিত নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে সার্ব্বভৌম

১১। "বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীৎ তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।"—(পদ্মপুরাণ)। যেহেতু জীব শ্রীবিষ্ণুরই অংশ, অতএব জীব 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত।

১২। "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥" "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥—(পদ্মপুরাণ)। ভগবান্ শ্রীশিবকে বললেন,—"কল্পিত নিজ ব্যাখ্যাদ্বারা ভোগোন্মুখ জনগণকে আমার থেকে বিমুখ কর। আমাকে এমন গোপন কর যাতে বহির্ম্মুখ সৃষ্টিকার্য্য উত্তরোত্তর হতে থাকে।" মহাদেব পার্ব্বতীদেবীকে বললেন,—"দেবি! আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ ক'রে অসৎশাস্ত্র 'মায়াবাদ'-রূপ প্রচ্ছন্ন অবৈদিক বৌদ্ধমত স্থাপন করবো।"

ভট্টাচার্য্য, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমস্ত শাঙ্করপন্থিগণের কাছে পদ্মপুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থসকল থেকে তা' প্রমাণ ক'রে বলেছিলেন—

**''আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।**
**অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল॥''** (চৈঃ চঃ ২।৬।১৮০)

**''তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাবাহী দাস।**
**আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥''** (চৈ চঃ ১।৭।১১৪)

এতে শাঙ্কর-মতাবলম্বিগণ অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠলেন।

এইপ্রকারে শাস্ত্রের নিরপেক্ষ অপ্রিয়-সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় নানাভাবেই নানাজনে আঘাত পেয়ে ক্ষোভে-দুঃখে চৈতন্য হারিয়েছেন। আর সেজন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধিতায় তাঁরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই কাগজে কলমে 'গুম্‌খুন' না করালে তাঁর পদাঙ্কানুসারীদের যে টিট্ করা যাবে না—'*ন রহেগা বাঁশ, ন বাজেগী বাঁশরী*'। আর সেই বাঁশরীর নিরপেক্ষ শাসন-সুর চিরতরে বন্ধ করা গেলে ধর্ম্ম-অধর্ম্মের অপূর্ব্ব 'সমন্বয়' সাধন সম্ভব হবে।—স্বেচ্ছাচারিতাকে অবাধে সর্ব্বস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে। পাঠকগণ! এইসকলই শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার মুখ্যকারণ।

# দ্বিতীয় প্রসঙ্গ
# শ্রীচৈতন্যদেব এবং অবতারবাদ

## আজকালকার শাস্ত্রছাড়া অবতার

আজকাল স্থানে স্থানে এবং দফায় দফায় শাস্ত্র-বহির্ভূত বুজ্‌রুকি-সিদ্ধ ভগবান্ সব ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছেন। গ্রামের অজ্ঞ লোকেরা দারোগার হম্বিতম্বি দেখে দারোগাকে এমনই সর্ব্বেসর্ব্বা ভেবে বসে যে, একসময় গ্রামের দুঃখদুর্দ্দশা সরেজমিনে দেখতে আসা মহামান্য 'লাট্ সাহেবের' প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে সেই তাঁকেও কিনা আশীর্ব্বাদ ক'রে বসে—''সাহেব! তুমি দারোগা হও''। ঠিক তেমনই যোগ-সাধনায় কিছু সিদ্ধি লাভ করে সেই যোগবিভূতির প্রদর্শনী খুললেই অজ্ঞ মানুষ তাঁকে 'ভগবান্' বলে মনে ক'রে নেয়। জন্মমৃত্যুর অধীন সেইসকল কল্পিত ভগবান্‌দের (?) সাথে সমান ক'রে সেই অজ্ঞগোষ্ঠী (হায় হায়!) তখন প্রকৃত ভগবৎতত্ত্বকেও কিনা জন্ম-মৃত্যুর অধীন জ্ঞান ক'রে বসে! আর ওদিকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত হয়ে সেই ব্যক্তিও তাদের অজ্ঞতা নিরসন ত' দূরের কথা, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদের অজ্ঞতাকেই প্রশ্রয় দিতে থাকেন, অবশেষে তিনি নিজেকেই ভগবান্ বলে জাহির করতে থাকেন! দিনের মধ্যে তিনবার যার বিভিন্ন পরিণামের শিকার হবার যোগ্যতা বর্ত্তমান, সেই জীবতত্ত্বের কিনা ত্রিগুণাতীত মায়াধীশ ঈশ্বর-অভিমান! কাকের ঠোঁট যদি সোনা দিয়ে, ঠ্যাং যদি মাণিক দিয়ে আর এক একটা পালকে গজমতি মুক্তা দিয়েও যদি সাজানো হয়, তথাপি সে কাকই থাকে, কখনও রাজহংস হতে পারে না।

**''কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিকযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।**
**একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥''**

পিতামাতার সব সন্তানই বাধ্য হয় না—অবাধ্য সন্তানও দুর্ভাগ্যবশে থাকে। সেপ্রকার দুর্ভাগ্যের তাড়নায় কারও কারও শাস্ত্রীয় 'আম্নায়'✶-বিচারে রুচি

✶ ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা ব্রহ্মা হতে গুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত 'ব্রহ্মবিদ্যা'-নামক 'শ্রুতি' সকলকে 'আম্নায়' বলা হয়।

নাও হতে পারে এবং সেই রুচির অভাববশতঃ মায়ামোহিত হয়ে স্বকল্পিত কোন মত প্রবর্ত্তনেও কেউ ব্রতী হতে পারে—কিন্তু সেজন্য ভগবানের আসন দখল করতে যাওয়া কেন? ধর্ম্মবিষয়ে গণচেতনাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে জীবের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে উন্নত করার জন্য একজন শাস্ত্রানুগ ধার্ম্মিক সমাজ-সংস্কারক হওয়া অপেক্ষাও কি একটী 'অবতার'-পদ অত্যন্ত জরুরী? এটা কি ভণ্ডামি নয়? রুইতনকে রুইতন বলতে অসুবিধা কিসের? পাশ্চাত্য-দার্শনিক 'মেক্‌লে' এইপ্রকার ভণ্ডামিকেই নিরুৎসাহিত করিতে বলেছেন—''More than a man you can not be."

## 'অবতার' কা'কে বলে

'অবতার' বলতে ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে অবস্থিত নিজ 'লোক' হতে শ্রীহরি বা শ্রীহরির বিশেষ কোন পার্ষদের ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অবতরণ বুঝায়। যেমন—'কৃষ্ণের অবতার', 'শঙ্করের অবতার' প্রভৃতি। 'অবতরণ'—এই ক্রিয়াপদ থেকেই 'অবতার'-শব্দের উৎপত্তি। 'অবতরণ' বলতে উপর হতে নীচে পড়ে যাওয়া বুঝায় না। স্বেচ্ছায় বা ঊর্দ্ধতন কাঁ'রও আদেশে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঊর্দ্ধলোক হতে নিম্নলোকে অনায়াসে আগমনই সেই 'অবতরণ'-শব্দের তাৎপর্য্য। সুতরাং 'অবতার' কখনও পতিত জীব ন'ন, বা পতিত জীবের লভ্য কোন অবস্থাও নয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'গোলোক' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধামে নিজরূপে ও শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত হয়ে নিজ নিজ স্বরূপোচিত লীলা সম্পাদন করেন। গোলোক প্রভৃতি নিত্য চিন্ময় ধামসকল এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত নয়। এই ব্রহ্মাণ্ডগত সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোর সেইসকল ধামকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, প্রবেশাধিকারই নেই[১]। ধাম-সকল স্বয়ংই আলোকিত ('ধাম' অর্থ—কিরণ, আলোক, আশ্রয় ইত্যাদি)। অনন্তকোটী এই

১। ''ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (গীঃ১৫।৬)—এই জগতের সূর্য্য, চন্দ্র কিংবা অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করতে পারে না। সেই আমার ধাম,—যে স্থানে গমন করলে আর কোন ব্যক্তিকে এই ব্রহ্মাণ্ডে ফিরে আসতে হয় না।



জড়ব্রহ্মাণ্ড সব শ্রীহরির 'একপাদ-বিভূতি' মাত্র; অপরদিকে তাঁর নিত্যলীলা-স্থল সেই চিন্ময় ধামসকল তাঁর 'তিনপাদ-বিভূতি'। (কূপের ব্যাঙের মত 'ব্যাঙের আধুলি'-সর্ব্বস্ব জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিতাভিমানী সেই আমাদের কাছে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চৌদ্দ-ভুবনই যেখানে অবিশ্বাস্য—সেখানে কোথায় অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আর কোথায়ই বা ভগবানের সেই তিনপাদ-বিভূতির ধারণা!) সেই সকল চিন্ময় ধামে ভগবানের যে নিত্যলীলা সংঘটিত হয়, তা' এই ব্রহ্মাণ্ডের লোক-লোচনের অতীত বলে তা 'অপ্রকট-লীলা' নামেই কথিত হয়। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত ভক্তগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিদের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যখন শ্রীভগবান্ সেই সেই নির্দ্দিষ্ট স্বরূপে এবং নিজ ধাম, পরিকরসহ অবতীর্ণ হন[২], তখন তা'কে 'প্রকট-লীলা' বলে। সুতরাং ভগবানের লীলাসকলই নিত্য—কখনও তার বিরাম নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে অবতারগণের সেইসকল 'অপ্রকট' এবং 'প্রকট' লীলার বর্ণনা আছে। অতএব 'অবতারগণ' হঠাৎ ক'রে সৃষ্ট কিছু নন—'ত্রিপাদ বিভূতির' সেই চিন্ময় জগতে তাঁদের নিত্যস্বরূপ, নিত্য-ধাম, নিত্য-পরিকর এবং নিত্যলীলা সকলই আছে। (এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই স্বঘোষিত বা পরঘোষিত অবতার (!) দের কি-ই বা নিত্যস্বরূপ, আর কোথায়-ই বা নিত্যধাম, আর কি-ই বা তাদের নিত্যলীলা! আর কি-ই বা শাস্ত্র-প্রমাণ!)

আবার অবতার-বিচারেও অনেক প্রকার-ভেদ আছে। ছয়প্রকার অবতারের কথা শাস্ত্রে ঘোষিত আছে—১। **পুরুষাবতার** (কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু), ২। **লীলাবতার** (মৎস্য, কূর্ম্ম, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি), ৩। **মন্বন্তরাবতার** (১৪ মন্বন্তরে ১৪ অবতার), ৪। **যুগাবতার** (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই ৪ যুগে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য ৪ যুগাবতার), ৫। **গুণাবতার** (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব; উল্লেখ্য যে, এস্থলে 'সত্ত্ব' গুণের অধিষ্ঠাতা-হেতুই বিষ্ণুকে 'গুণাবতার'

২। ''পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪।)

বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি 'পুরুষাবতার'), এবং ৬। **আবেশাবতার** (বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য ভগবৎপ্রেরিত কোন যোগ্য জীবে তাঁর শক্তি আবিষ্ট হয়, যেমন পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি)।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন হতেই পারে সাম্প্রতিককালের এই অবতারগণ তাহলে কোন্ শ্রেণীর অবতার? এ পর্য্যন্ত এইসব 'অবতার' (!)গণকে সেই সেই স্তাবক-গোষ্ঠীর দ্বারা 'যুগাবতার' বলে পরিচয় দিতে দেখা যায়। তার প্রমাণ হিসাবে গীতার সুবিখ্যাত সেই **"সম্ভবামি যুগে যুগে"** (গীঃ ৪।৮) বাক্যটী তাঁরা ঘনঘন উল্লেখ করে থাকেন। তাদের ধারণায়—"যুগে যুগে" বলতে প্রতি বৎসর বৎসরই 'যুগাবতার' আসেন, কিংবা '১২ বৎসরে এক যুগ"—হিসাবে নিদেনপক্ষে ১২ বৎসর অন্তর তাঁকে আসতেই হয় (কুম্ভমেলার মতো)।

কিন্তু বাস্তবে 'যুগাবতার' বলতে কি বুঝায়, তাঁর কি কার্য্য—এসব জানা থাকলে 'যুগাবতার' সাজার বা সাজানোর দুরাগ্রহ থাকতো না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই ৪ যুগে ৪ 'যুগধর্ম্ম' প্রবর্ত্তনের জন্যই ৪ যুগাবতার এই জগতে আবির্ভূত হন। সত্যযুগের যুগধর্ম্ম—ধ্যান, ত্রেতাযুগে—যজ্ঞ, দ্বাপরে—অর্চ্চন এবং কলিযুগে তা হরিকীর্ত্তন[৩]—শ্রীমদ্ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই এইসকল বিঘোষিত হয়ে আছে। কিন্তু কলির সেই তথাকথিত যুগাবতারগণ ( !) কার্য্যতঃ সকল-কল্যাণের আকর সেই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই (১৬ নাম, ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রকেই) বর্জ্জন ক'রে সাধারণ অজ্ঞ-সমাজের কাছে নিজকে 'নারায়ণ', কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, রাম-কৃষ্ণ মিলিত-অবতার, নিতাই-গৌর মিলিত-অবতার, মহামহাপ্রভু প্রভৃতি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন; কেবল তা-ই নয়, তা'রা শব্দব্রহ্ম শ্রীমহামন্ত্রের অনুকরণে কৃমি-কীট-ভক্ষ্য নিজ নিজ দেহ-গেহ-স্ত্রী সম্পর্কিত জড়নাম বা শব্দের গান পর্য্যন্তও করিয়ে

৩। "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"(ভাঃ ১২।৩।৫২)। "ধ্যায়ন কৃতে জপন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্॥"(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)। কৃতযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে শ্রীহরির নাম-গুণ কীর্ত্তনদ্বারাই সে-ফল লাভ হয়ে থাকে।



থাকেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনকে যুগধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠা না ক'রে নিজ নিজ কল্পনাজাত নানা মত, নানা ছড়া 'যুগধর্ম্মের' নামে প্রচার করে যাচ্ছেন। এ সবের দ্বারা তাঁরা প্রকারান্তরে স্বেচ্ছাচারিতাকেই যুগধর্ম্ম বলে স্থাপিত করছেন—এঁরা প্রকৃতপক্ষে শ্রৌতপথ এবং বিষ্ণুর 'অবতার'-বাদের বিরোধীই।

## শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া 'অবতার'-রূপে মেনে নেওয়া অন্যায়

প্রমাণদ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হবার পরেই আমরা যে কোন বিষয়ে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হতে পারি। 'প্রমা'-শব্দের অর্থ নিশ্চয়বোধ। সেই প্রমাণের অভাব হলে যে কোন বিষয়ই তা'র বিশ্বস্ততা (Authenticity) হারিয়ে ফেলে। এই জগতে আমাদের সাধারণ জনজীবনেও প্রতি পদে প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। অথচ জগতের সেই প্রমাণ-নিষ্ঠ ব্যক্তিগণই পরমার্থ-বিষয়ে এতই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, সে-সময় আর প্রমাণ-অনুসন্ধানের ধার ধারেন না, যাচাই করে নেওয়ার সব যুক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিভাবে তাঁরা এত মোহিত হন, সে-বিষয়েও সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলেছেন,—

**"ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃত-চেতসাম্।**
**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"** (গীঃ ২।৪৪)

অর্থাৎ ভোগ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি যারা অত্যন্ত আসক্ত থাকে, তারা চেতনা খুইয়ে বসে। সে-অবস্থায় তাদের বস্তুতঃ পরমার্থ-বিষয়ে কোন যত্নই থাকে না; কেবল ভোগের ইন্ধন-সন্ধানমূলেই তারা 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' ক'রে বেড়ায়। সেই ইন্ধন যিনি দিতে পারেন, তিনিই তাদের কাছে 'ভগবান্', 'অবতার' ইত্যাদি। সুতরাং সেইকালে তাদের প্রমাণ-অনুসন্ধানের দরকারই হয় না।

অথচ ভগবান্ আমাদের এ-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ক'রে দিয়েছেন,—'দেখ অর্জ্জুন! কি করণীয় এবং কি অকরণীয়—তা নির্দ্দিষ্ট ক'রে নিতে কা'রও কোন কল্পনা নয়, শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। সেই প্রমাণকে লঙ্ঘন ক'রে স্বেচ্ছাচারে রত থাকলে কোনকালেই কি সুখ, কি সাধনসিদ্ধি, আর কি পরাগতি—কোনটিই লাভ হবে না' (গীতা ১৬।২৩-২৪)। অতএব 'অবতার'-

নির্ণয়কালে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে নয়, কিংবা 'মন বলছে'—এ প্রকার মনোধর্ম্মে তাড়িত হয়ে নয়, অথবা যোগ-বিভূতির কোন প্রদর্শনীতেও মুগ্ধ হয়ে নয়—শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলেই 'অবতার' চিহ্নিত করার বিধান। এজগতে কা'রও স্থাবর-অস্থাবর-সম্পত্তির প্রমাণ হিসাবে যে-প্রকার দলিল-দস্তাবেজ অথবা কারও নিজ পরিচয়ের প্রমাণরূপে পরিচয়-পত্র (identity-card) অনস্বীকার্য্য, সেইপ্রকার কোন নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-প্রমাণ ছাড়াই কা'কেও 'অবতার'-বিভূষণে ভূষিত করার রীতিও অত্যন্ত অন্যায়। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান্ কলিযুগের ছল, কপটতা ও প্রবঞ্চনা-সম্বন্ধে বিশেষ অবহিতই আছেন। তাই শাস্ত্রেই তিনি সকল বিষয়ে সকল প্রকার তত্ত্ব, আদেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ সম্পূটিত করে রেখেছেন। শাস্ত্র আছে বলেই 'ব্রহ্ম', 'পরব্রহ্ম', 'ঈশ্বর', 'পরমাত্মা', 'পরমেশ্বর', 'ভগবান্', 'অবতার'—প্রভৃতি লোকাতীত বিচারসকল লোকগোচর হয়ে থাকে। সে-স্থলে সেই শাস্ত্রই যদি অস্বীকৃত হল, তবে 'অবতার' ব্যাপারটীকেই বা আর মানা কিসের?

অনেকে মনে করে থাকেন,—'শাস্ত্র' কিংবা 'অবতার'—এসকল মানুষেরই সৃষ্টি,—ঋষি-মুনিগণ তাঁদের কল্পনার ফানুসে চড়ে যে-সকল প্রজল্প করে গেছেন—তা-ই নাকি 'শাস্ত্র'। আশ্চর্য্য যে, সেই 'শাস্ত্র না মানা' লোকগুলিকেই 'হঠাৎ-অবতার' তৈরীতে অত্যুৎসাহী হয়ে যেতে দেখা যায়। তাদের ভাবনায়—যিনি যত পরিমাণে তাদের অনাদি বহির্ম্মুখতার 'সাদা-কাল' পর্দ্দায় উন্নততর রঙিন প্রলেপের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ—জাগতিক অভাবগুলি পূরণ ক'রে (!) এই জগতেই স্থায়ীবাসের মৌরসী পাট্টা প্রদানে ওস্তাদ—আজন্ম 'কর্ম্মবাসনা'কে সুড়সুড়ি দেওয়া মন-চাঙ্গান 'কথামৃত' পরিবেশনে পটু—তিনি তত পরিমাণে 'অবতার'। এইপ্রকার 'অবতার' যে মানুষেরই সৃষ্টি—এতে কোন সংশয় নেই। এই সকল অবতারের পূজারীরা আবার তাদের নগ্ন অজ্ঞানতাকে কিছু শাস্ত্রীয় পোষাকে ভূষিত করতে মাঝে মাঝে কিছু 'শাস্ত্র' উদ্ধৃত করেন—অর্থাৎ দেখান যে,—'আমরাও শাস্ত্র জানি।' কিন্তু তাতে যে তারা ব্যাখ্যা-বিবৃতি করেন, তাতেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে,



"Devils can quote scriptures." আর তাদের কাছে যখন শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরা হয়, তখন তারাই নিঃসঙ্কোচে বলে বসেন—'আমরা যদি শাস্ত্র না মানি।' অর্থাৎ নিজ দুষ্টামির প্রশ্রয় থাক্‌লেই তা 'শাস্ত্র', না থাক্‌লে—তা dismissed (খারিজ্)।

কিন্তু 'ঈশ্বর' বা 'অবতার' কিছু দেহগত চক্ষু বা মনশ্চক্ষু-দ্বারা দর্শনের বস্তু নন—'শাস্ত্রচক্ষু'র আশ্রয়ে আত্মচক্ষু উন্মীলিত হলে তবেই তা বোধগম্য হয়। জগতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারগত ব্যক্তিদেরকে কিছু উন্নত অবস্থায় আনয়ন ক'রে নিত্যশ্রেয়ঃ লাভের উপযোগী ক'রে তুলতে ঈশ্বরেচ্ছায় জগতে বিশেষ তেজঃসম্পন্ন কারও আগমন অবশ্যই সম্ভব। "**কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে**" (চৈঃ চঃ)—সুতরাং কৃষ্ণভক্তে তথা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির মধ্যে কিছু অলৌকিক গুণাবলীর সঞ্চার কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আবার, যোগ-সাধনার দ্বারাও অনেক যোগ-বিভূতির অধিকারী হওয়া সম্ভব। তাই বলে সেই অলৌকিক গুণাবলী কিংবা যোগ-বিভূতি হেতু তাঁদেরকে স্বয়ং 'শ্রীকৃষ্ণ' বা তাঁ'রই কোন 'অবতার'-রূপে নির্ণয় করা কখনই শাস্ত্রসম্মত নয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এইপ্রকার 'জীবে ঈশ্বরত্ব আরোপ' (Apotheosis) সম্পূর্ণরূপে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন। জীবকে নিজ আচরণ দ্বারা শিক্ষা প্রদান করার জন্য এমনকি তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও তাঁর প্রতি 'কৃষ্ণ'-সম্বোধন-কারিগণকে তিরস্কার করেছেন,—

**প্রভু কহে,—"'বিষ্ণু', 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা।**
**জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥**
**সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণকণ-সম।**
**ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ—হয় সূর্য্যোপম॥**
**জীব, ঈশ্বরতত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।**
**জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥** (চৈঃচঃ ২।১৮।১১১-১১৩)

কথায় বলে—'চক্‌চক্ কর্‌লেই সোনা হয় না।' 'সোনার মতো' এবং যথার্থ সোনার মূল্য অবশ্যই এক হতে পারে না। সেই 'সোনার মতো'

কিছুকেই কখনও সোনা অপেক্ষাও অধিক উজ্জ্বল বলে মনে হয়—আর তাতেই অধিক আকৃষ্ট হয়ে সোনা মনে ক'রে যে আত্মপ্রবোধ লাভ, তা এক ক্ষুদ্রবুদ্ধিগণের পক্ষেই সম্ভব। সুমেধাগণ তা'তে কখনই মোহিত হন না।

## শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা শাস্ত্র-প্রমাণিত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা গণমতের ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে হয় নাই—সর্ব্বশাস্ত্রে তা বিজ্ঞাপিত হয়ে আছে। ভগবান্ কে, কোন্ রূপে, কখন্, কি বিশেষ কার্য্যে, কোথায় অবতীর্ণ হবেন, তা শাস্ত্রেই পূর্ব্ব-উল্লিখিত হয়ে আছে—এ জগতের ভ্রম-প্রমাদে ভরা পণ্ডিতাভিমানীদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকে নাই। সুতরাং এ সম্পর্কে কারও কোনরকম অনুমান করবার বা 'আমার মন বলছে' ইত্যাদি কিছু বলবার অবকাশ নাই। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ পরম ধুরন্ধর পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রথমে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে শিষ্যগণ-সহ তাঁরই ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের সাথে এক সম্মুখ বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; অর্থাৎ, তিনি দেখালেন—কেবল মুখের কথায় নয়, শাস্ত্রপ্রমাণেই তাঁর ভগবত্তা গ্রাহ্য। তাঁদের সেই কথোপকথনের কিছু অংশ নীচে উল্লেখিত হল,—

শিষ্যগণ কহে—'ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে?'
(শ্রীগোপীনাথ) আচার্য্য কহে—'বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥'
শিষ্য কহে—'ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে—'**অনুমানে নহে ঈশ্বর-জ্ঞানে**॥' (চৈঃ চঃ মধ্য ৬)

শ্রীভট্টাচার্য্য স্বয়ং প্রতিবাদী হয়ে বললেন,—

''মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি,—(এই) শাস্ত্রজ্ঞান॥"

শ্রীগোপীনাথাচার্য্য তদুত্তরে বললেন—

''শাস্ত্রজ্ঞ করিঞা তুমি কর অভিমানে॥



'ভাগবত'-'ভারত' দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে (তোমার) নাহি অবধান!!
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার!!
**কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্।**
**অতএব 'ত্রিযুগ'* করি' কহি তার নাম॥**
**প্রতিযুগে করান কৃষ্ণ যুগ-অবতার।**
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥"

তথাহি শ্রীভাগবতে (ভাঃ ১০।৮।১৩)—

**'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ**
**শুক্লো রক্তস্ততথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥** [৪]

তত্রৈব (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)—

**ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।**
**নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥**
**কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।**
**যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"** [৫]

---

* **ত্রিযুগ**—সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিনযুগেই কেবল লীলাবতারের বিচার থাকায় ভগবানকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। কিন্তু কলিতে যুগাবতারের উদয় অন্যান্য যুগের মতই ঘটে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৩৮) শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদের স্তুতিতে দেখা যায়—''ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।" (অর্থাৎ হে প্রভো! আপনি কলিযুগে ছন্নরূপে আবির্ভূত হন বলে আপনাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়।) এই বাক্য-অনুসারে শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ছন্নাবতার'-রূপেই জানা যায়। এই অবতারে ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় তাঁর ভক্তোচিত লীলারই প্রাধান্য।

৪। গর্গমুনি নন্দমহারাজকে বললেন,—তোমার এই বালক প্রতিযুগেই যুগোচিত তনু ধারণ করেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ হয়েছিলেন, তথা কলিতে পীতবর্ণবিশিষ্ট হবেন এবং ইদানীং দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

৫। এইভাবে দ্বাপরযুগে জগদীশ্বরকে পূজা করা হয়ে থাকে। এখন হে রাজন্! কলিযুগেও

মহাভারতে চ দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (১২৭, ৭৫)—

**"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।**
**সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥** [৬]

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ॥
তোমার উপরে তাঁ'র কৃপা হবে যবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥"

শ্রীগোপীনাথাচার্য্য এইপ্রকারে শাস্ত্র-প্রমাণ উল্লেখ-দ্বারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট মহাপ্রভুর ভগবত্তা স্থাপন করলেন; দেখালেন—মহাপ্রভুর ভগবত্তা কোন মন-গড়া কথা নয়।

কাশীতে অবস্থানকালে ভগবৎপার্ষদ শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাথে অবতার-তত্ত্ব আলোচনা-কালে তাঁর নিকটই সবিনয় প্রশ্ন রেখেছিলেন, —"**কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার?**" উত্তরে মহাপ্রভু বলেন,—

প্রভু কহে,—"অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র-'পরমাণ'।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥
**অবতার নাহি কহে—আমি অবতার।**
**মুনি সব জানি' করে লক্ষণ-বিচার॥**

নানা শাস্ত্রবিধানে যেভাবে তাঁর পূজা হয়, তা শ্রবণ কর। যাঁর মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ'-বর্ণ, যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করে থাকেন।

৬। সুবর্ণ-বর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, 'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল'-তনুবিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন-মালা শোভিত, সন্ন্যাসগ্রহণকারী, হরির রহস্য আলোচনাকারী 'শম' ('শম' আলোচনে—'চুরাদি'), কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ 'শান্ত', কেবল কীর্ত্তনপর 'নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ'—প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুর নাম। (বলাবহুল্য, শ্রীমন্মহাপ্রভু ছাড়া ভগবানের আর কোন সন্ন্যাস-মূর্ত্তি নাই)।



'স্বরূপ'-লক্ষণ, আর 'তটস্থ'-লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থ-লক্ষণ॥"

(চৈঃ চঃ ২।২০।৩৫২-৩৫৭)

সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীসনাতন গোস্বামী তখন বিচার কর্‌লেন,—**'কলিযুগে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ—'পীত' অর্থাৎ গৌরবর্ণ এবং তটস্থ-লক্ষণ—প্রেমভক্তি দান ও সঙ্কীর্ত্তন কার্য্য**। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি সকল শাস্ত্রই এই দুটীকে কলিযুগে ঈশ্বর-লক্ষণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সে-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যুগাবতার মাত্র নন। কলিযুগে যুগাবতারের স্বরূপ-লক্ষণ 'পীতবর্ণে' তিনি সন্দীপিত হলেও তাঁর মহিমা কেবল যুগাবতারত্বেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি স্বয়ং পরাৎপরতত্ত্ব—সমস্ত অবতারের কারণ সর্ব্বাবতারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত (১৩ পৃষ্ঠায় কথিত) ছয়প্রকার অবতারের অন্যতম নন, তিনি—'স্বয়ং ভগবান্'। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের অর্থ হল—**"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥"**—(চৈতন্যচরিতামৃত ১।২।৮৮)।[৭] পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা তারস্বরে কীর্ত্তন করেছেন,—

**"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"**—(ভাঃ ১।৩।২৮)।

শ্রীরাম-নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারসকল পুরুষাবতারের অংশ বা কলা, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—'লীলাপুরুষোত্তম'-রূপে যিনি সর্ব্বধাম-উত্তম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য আনন্দে বিরাজমান। সেই মূল বৃন্দাবন 'কৃষ্ণপীঠ'

৭। "রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্, নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" (ব্রহ্মসংহিতা)—যে পরমপুরুষ নিজ অংশ কলা—এই নিয়মে রামাদি বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্ত্তিতে নানাবতার প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ংরূপ সেই বংশীবাদন কৃষ্ণরূপেই অবস্থিত থাকেন, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এবং 'গৌরপীঠ'—এই দুই পৃথক্ (অথচ অভিন্ন) প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট। পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 'সম্ভোগ-লীলা'-বশে কৃষ্ণপীঠে তিনি শ্রীযশোদানন্দন এবং 'বিপ্রলম্ভ-লীলা'-বশে একই সাথে গৌরপীঠে তিনি শ্রীশচীনন্দন 'গৌরহরি'। হরিনামোন্মত্ত শ্রীমহাদেব 'অনন্তসংহিতা'য় 'গৌরহরি'-নামের গুহ্য অর্থ এইরূপ প্রকাশ করেছেন,—

**''গৌরী শ্রীরাধিকা দেবী হরিঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।**
**একত্বাচ্চ তয়ো সাক্ষাদিতি গৌরহরিং বিদুঃ॥''**

অর্থাৎ, শ্রীমতী রাধিকা—'গৌরী' এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—'হরি'; এই উভয়ের মিলিত বিগ্রহই 'গৌরহরি'-নামে বিদিত হন।

সকল কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দর যুগাবতার-রূপে অবতীর্ণ হন না। আবার সর্ব্ব দ্বাপরযুগেও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অবতরণ সংঘটিত হয় না। ব্রহ্মার প্রতিকল্পে ১৪ মন্বন্তরের মধ্যে 'বৈবস্বত'-নামক যে ৭ম মন্বন্তর, তার ২৮তম চতুর্যুগের দ্বাপরেই মাত্র স্বয়ং গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণপীঠ'-সহ ভূলোকে অবতীর্ণ হন। এবং সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগেই বৃন্দাবনের অপর অংশ 'গৌরপীঠ'-নাথ শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়মণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হন। কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম যে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তা যুগাবতারই প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু 'কৃষ্ণপীঠ'-সম্বন্ধীয় সেই সর্ব্বোন্নত এবং সর্ব্বোজ্জ্বলা প্রেমভক্তির প্রকাশ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ রাধাভাব-কান্তি-সুবলিত শ্রীগৌরচন্দ্র ছাড়া কোন অংশাদি অবতারের দ্বারা সম্ভব নয়। 'অবতার'-তত্ত্বের এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সজ্ঞান হলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের অনন্য মহিমা অন্তরস্পর্শী হয়। সেই তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা ক'রে নূতন নূতন অবতার কল্পনা করা যে ওহ্! কতখানি স্পর্দ্ধার কথা, কতখানি ধৃষ্টতা, তা ভাবা যায় না।

## শ্রীচৈতন্যোত্তরকালে শ্রীচৈতন্য-বিরোধী যত কলির অবতার

সুতরাং স্পষ্টতঃই দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভগবত্তা এবং অবতার-তত্ত্ব রীতিমত শাস্ত্রভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তা' কারও সমর্থন বা অসমর্থনের জন্য অপেক্ষা করে না।



**''প্রভু কহে—অন্যাবতার শাস্ত্রদ্বারে জানি।**
**কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রবাক্যে মানি॥''**

(চৈঃ চঃ ২।২০।৩৫২)

—এটী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপদেশ। অর্থাৎ এর দ্বারা আমাদের প্রতি প্রকারান্তরে শাস্ত্রপ্রমাণ ছাড়া ভগবান্ নিজকেও 'অবতার' বলে মেনে না নেওয়ারই নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যোত্তরকালে সেই শাস্ত্রপ্রমাণের পরওয়া না করেই একের পর এক যে ভণ্ড অবতারগণের প্রবাহ চলছে, তা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনকে আচ্ছাদিত করার উদ্দেশ্যেই। ভোগের প্রশ্রয়-দান-মূলে যেন তেন এক মতবাদ, যা খুব সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং মনোরঞ্জক ছড়া-কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রকাশ ক'রে অজ্ঞ সাধারণ গোষ্ঠীকে যুগধর্ম্ম-বিষয়ে বিভ্রান্ত এবং বঞ্চিত করাই তাঁদের একমাত্র 'মিশন'। বলাবাহুল্য এটীই কলির কার্য্য। সুতরাং এইসকল তথাকথিত 'অবতার'দের বরং 'কলির অবতার' অথবা 'কলিপ্রেরিত জন' বলাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত নয় কি?

## মহাপ্রভুর কথিত 'দুই অবতার' রহস্য

ইতোমধ্যেই কিছু জগদ্বঞ্চক এবং বঞ্চিতকে ঐক্যতানে কীর্ত্তন করতে শুনা যায়—শ্রীচৈতন্যদেব নাকি তাঁর প্রকটকালেই তাঁর অন্তর্দ্ধানোত্তর-কালে আরও দুই অবতারের কথা ঘোষণা করেছিলেন—যাঁদের অদ্ভূত কার্য্য নাকি স্বয়ং মহাপ্রভুরও অজানা! এই সম্পর্কে সেই জগদ্দ্বেষী ও নিত্যমঙ্গল-প্রতিকূল-দলের কেউ কেউ তাদের কল্পিত 'চৈতন্যভাগবত' থেকে স্বরচিত ছড়া উদ্ধৃত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' যা উল্লেখিত আছে, তা এস্থলে উদ্ধৃত হলো,—

**''এই মত আরো আছে দুই অবতার।**
**'কীর্ত্তন'-'আনন্দ' রূপ হইবে আমার॥''** (চৈঃভাঃ২।২৭।১৩)

শ্রীগৌরসুন্দরের এই বাক্যের দোহাই দিয়ে পাষণ্ডীরা কিছু যুগধর্ম্ম-বিরোধিদেরকেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতাররূপে স্থাপন করেন।

যুগোচিত 'তারকব্রহ্ম'✶ নামকে উপেক্ষা ক'রে সেই ২ অবতারের দ্বারা যে কোনপ্রকার ছড়া-কীর্ত্তন বা জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-পরিপূরক এমনকি মোক্ষসাধক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনই যদি মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হতো, তবে তাঁর ৪৮ বৎসর যাবৎ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনাত্মক লীলাপ্রকাশ বা শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতির মাধ্যমে 'সাধ্য-সাধন'-তত্ত্ব প্রকাশের দ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষধিক্কারী কৃষ্ণ-প্রেমকেই প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ছিল? অথবা তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে এবং নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে তিনি যখন প্রতি ঘরে ঘরে এক কৃষ্ণ-ভজন প্রচারের মাত্র আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন, তখন—**"ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা"** (চৈঃ ভাঃ ২।৩।১০)—এইপ্রকার আদেশেরই বা মহাপ্রভুর কি আবশ্যকতা ছিল? পাষণ্ডীরা কি বল্‌তে চান যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অন্তর্দ্ধানোত্তর-কালে 'দুই অবতার'কে পাঠিয়েছিলেন তাঁরই প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে জল ঢেলে দেওয়ার জন্য?

বলাবাহুল্য শ্রীচৈতন্যোত্তর-সময়ে সেই ২ অবতারের স্থানে এ-পর্য্যন্ত প্রায় ২০ অবতার (!) এসে এই ভারতভূমিতে ততোধিক সাধ্য-সাধনের দোকান খুলে বসেছেন। এমতাবস্থায় সাধারণ অজ্ঞ সমাজ নিত্যমঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিভ্রান্তির আবর্ত্তে পতিত না হয়ে পারবেন কি?

✶ সত্য-যুগের 'তারকব্রহ্ম'—

"নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তিঃ, নারায়ণ পরাগতিঃ॥"

ত্রেতা-যুগের 'তারকব্রহ্ম'—

"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

দ্বাপর-যুগের 'তারকব্রহ্ম'—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥"

কলি-যুগের 'তারকব্রহ্ম'—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"



সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথিত "দুই অবতার"-তত্ত্ব আদৌ সেই কলির অনুচরদের ব্যাখ্যানুরূপ নয়। "Devils can quote scriptures"—শয়তানেরাও শাস্ত্রবাণী উল্লেখ করে, কিন্তু ব্যাখ্যা ক'রে থাকে নিজ নিজ সুবিধানুরূপ। বস্তুতঃ এই "দুই অবতার"-তত্ত্বের রহস্য শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই উন্মোচন ক'রে গেছেন, কিন্তু দুরভিসন্ধিবশতঃ তা আর সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় না; সেই রহস্য-ভেদটী এইপ্রকার—

"আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর **'অর্চ্চামূর্ত্তি'** মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা **'নামের' জননী**॥"

(চৈঃ ভাঃ ২।২৭।৪৭-৪৮)

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে শচীমাতার নিত্য-জননীত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেছিলেন,—'মা! এই কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-পর কলিযুগে আমার আরও দুইটী অবতারের প্রকাশ হবে,—সেই উভয়ক্ষেত্রে তুমিই আমার জননী। প্রথমটী আমার **'অর্চ্চাবতার'**—সেক্ষেত্রে তুমি ধরণী-স্বরূপা এবং দ্বিতীয়টী আমার **'নামাবতার'**—সেস্থলে তুমি জিহ্বাস্বরূপা।' অর্থাৎ অর্চ্চাবিগ্রহ, শ্রীনাম এবং শ্রীস্বরূপ পরস্পর যে অভিন্ন, সেটীই মহাপ্রভু বুঝাতে চেয়েছিলেন।

**"নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।**
**তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ॥"**

(চৈঃ চঃ ২।১৭।১৩১)

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রীনাম' এবং 'শ্রীবিগ্রহ'—এই দুইরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হয়ে ভক্তগণের নিকট 'কীর্ত্তন' ও 'আনন্দ'-রূপে নিত্য বিরাজিত থাকবেন—এইটীই তাঁর বক্তব্য।

কিন্তু হায়! 'উল্টো বুঝ্‌লি ও বুঝালি'র দল কিভাবেই না অর্থ-বিকৃতি ঘটিয়ে কলির ধর্ম্ম বৃদ্ধি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে! তাই না সবসময় সকলকে সতর্ক করানো হয়—'নকল হইতে সাবধান!'

## শ্রীচৈতন্যদেবের পর শ্রীকল্কি-অবতারেরই প্রসঙ্গ

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পর থেকে কলিযুগের শেষভাগে 'কল্কি-অবতারের' সময় পর্য্যন্ত আর কোন অবতারের প্রসঙ্গই শাস্ত্রে নেই। কলিযুগের বত্রিশ-সহস্র বৎসর অবশিষ্ট থাকতে শ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হবেন—"**কলেঃ শেষে তথাহং বৈ দ্বাত্রিংশাব্দসহস্রকে**"—ভবিষ্যপুরাণ। উক্ত পুরাণে তাঁর অবতার প্রসঙ্গে দেখা যায়—কলির চতুর্থ চরণ আরম্ভ হলে পর 'সম্ভল'-নামক গ্রামে পিতা 'বিষ্ণুযশা' এবং মাতা 'বিষ্ণুকীর্ত্তি'কে আশ্রয় করে অগ্রহায়ণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিতে শ্রীকল্কিদেব আবির্ভূত হবেন। দিব্য অশ্বে সুশোভিত হয়ে খড়্গ-বর্ম্ম ধারণ করে তিনি দৈত্যরূপ ম্লেচ্ছগণকে সংহার করবেন।

"**ভোঃ সুরাঃ সম্ভলগ্রামে কশ্যপোঽয়ং জনিষ্যতি।**
**নাম্না বিষ্ণুযশাঃ খ্যাতো বিষ্ণুকীর্ত্তিস্তু তৎপ্রিয়া॥**
**বিষ্ণুকীর্ত্ত্যাং স ভগবান্ পূর্ণো নারায়ণো হরিঃ।**
**জনিষ্যতি মহাবিষ্ণুঃ সর্ব্বলোক-শিবঙ্করঃ॥**
**নিশীথে তমসোদ্ভূতে মার্গকৃষ্ণাষ্টমীদিনে।**"
"**তদা স ভগবান্ কল্কিঃ পুরাণপুরুষোদ্ভবঃ।**
**দিব্যং বাজিনমারুহ্য খড়্গী বর্ম্মী চ চর্ম্মধৃক্।**
**ম্লেচ্ছাংস্তান্ দৈত্যভূতাংশ্চ হত্বা যোগং গমিষ্যতি॥**"
(ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গপর্ব্ব)

সুতরাং পাঠকবর্গ, 'অবতার' সম্বন্ধে অযথা বিভ্রান্ত হবেন না। আলোচ্য 'প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে হেয় করবার কোনপ্রকার উদ্দেশ্য নেই। এ যাবৎ যত আলোচনা হয়েছে এবং যা হবে, তা বর্ত্তমানের বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর অবস্থার বিশেষ পর্য্যালোচনা-মূলেই।

"**কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।**
**কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ॥**"(ভাঃ ১২।৩।৫১)

কলি সর্ব্বদোষের আকর—অধর্ম্ম-বিষয়ে এই যুগে অসম্ভব কিছুই নেই। তথাপি এর মধ্যে একটীই মহান্ গুণ যে, কৃষ্ণের কীর্ত্তনদ্বারাই জীব



বন্ধনমুক্ত হয়ে ভগবান্‌কে লাভ করতে পারে। সেই যুগধর্ম্ম কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরোধিতা করে যিনি যাই কিছু প্রচার করুন, তা সকলই যে কলির প্রেরণা মূলেই—এতে কোনপ্রকার সংশয়ই থাকতে পারে না। পরমকারুণিক শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দেবদুর্ল্লভ সেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে এই ধরাধামে প্রতিষ্ঠা করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভাগ্যহত আমরা। তাই অপার করুণা-বরুণালয় সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেই নানা বিগর্হিত সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছি।

"অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
**কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥**
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
**সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহত জন॥**" (চৈঃ চঃ ২।১১।৯৮-৯৯)

"**নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।**
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ ১।৭।৭৪)

"**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।**
**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥**
প্রভু বলে—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" (চৈঃ ভাঃ ২।২৩।৭৬-৭৮)

ইহার বিরোধ করে যত অবতার।
অবতার নহে—সে 'কলির' অন্যাকার॥
অবতার কভু শাস্ত্র লঙ্ঘন না করে।
শাস্ত্র লঙ্ঘি' ভগবান্ নাহি অবতরে॥
সত্য কহি—ইথে কিছু না করিহ রোষ।
নিরপেক্ষ শাস্ত্রবাক্য—নাহি কোন দোষ॥

# তৃতীয় প্রসঙ্গ
# শ্রীচৈতন্য-শাস্ত্র এবং নারকী রচনাবলী

## কোন্‌টী আলোচনীয়—শাস্ত্র, না অশাস্ত্র?

সাধারণ মানুষ নিরপেক্ষতা-সূত্রে এক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন যে,—'শাস্ত্র' কাকে বলে? শাস্ত্র ও অশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? শাস্ত্র বা অশাস্ত্র-পাঠের ফল কি? এই বিষয়ে প্রথমেই কিছু আলোকপাত করা অবশ্যই প্রয়োজন।

'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' বলে দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ শব্দের অস্তিত্ব আমরা এই জগতে সকলেই লক্ষ্য করি। প্রথমে আলোচিত হোক্, 'বিদ্যা' কাকে বলে? **"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া"** (ভাঃ ৪।২৯।৪৯)—সেইটীই বিদ্যা, যা অবলম্বনে শ্রীভগবানের প্রতি অকপট মতি লাভ হয়। সুতরাং এতে 'অবিদ্যা'র সংজ্ঞাও স্পষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ যার দ্বারা ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি পায়, সেটীই 'অবিদ্যা'। বিদ্যা-লাভ হলে জীব 'পরমার্থে'র অধিকারী হয়ে 'পরাগতি' লাভ করে; অপরদিকে 'অবিদ্যা'-বশে জীব অন্ধকার তামসী গতি লাভ করে —**"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।"** (ঈশোপনিষৎ)।

'শাস্ত্র'—পারমার্থিক মহাজনগণের দ্বারা উপদিষ্ট হরিভক্তি-প্রদায়িকা সে-সকল 'বিদ্যা'রই এক সংহৃতি বিশেষ। সুতরাং শাস্ত্রই সর্ব্বদা আলোচনীয়। এ-ছাড়া যাতে ভগবদ্বিমুখতা, আসুরিকতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, সেই 'অশাস্ত্রে'র আলোচনা কখনও করতে নেই।

**"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।**
**শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"**(জৈমিনি ভারত)

অর্থাৎ,যে-শাস্ত্রে হরিভক্তির কথা নাই, স্বয়ং ব্রহ্মা সেই শাস্ত্রের বক্তা হলেও, তা কখনই শ্রবণীয় নয়। এস্থলে 'ব্রহ্মা'-শব্দের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, বক্তা আপাত-দৃষ্টিতে যতই 'অধিকারী' বলে মনে হোক্ না কেন, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের বিরোধী হন, তবে তার কথা অশ্রাব্য বলেই গণ্য।



পুনরায়, স্কন্দপুরাণে শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্পষ্টরূপেই নির্দ্ধারিত হয়েছে।—

**"ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।**
**মূল-রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥**
**যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।**
**অতোঽন্য-গ্রন্থ-বিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"**

অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব—এই চারি বেদ, মহাভারত, মূল রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র—এই সকলই 'শাস্ত্র' নামে কথিত। এঁদের অনুকূল অর্থাৎ অনুগত যে-সকল গ্রন্থ, তাও 'শাস্ত্র' বলে গণ্য। এছাড়া আর যত কিছু, সব কেবল গ্রন্থবিস্তার মাত্র—শাস্ত্র ত' নয়ই, পরন্তু তাকে 'কুবর্ত্ম' অর্থাৎ কুমার্গ বলা হয়। 'কুবর্ত্ম' এই কারণে যে, সে-সকলের আলোচনায় আসুরিকতাই বৃদ্ধি পেয়ে অধোগমনই ঘটে থাকে। চেতনার অপপ্রয়োগ ঘটালে আসুরিক যোনিতে নিক্ষিপ্ত হতেই হবে—সেটী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় (গীঃ ১৬।১৯-২০) নিশ্চয় করে দিয়েছেন। সুতরাং এতে 'শাস্ত্র' ও অ-শাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই—এ-সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা বাহুল্য মাত্র। **"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং"** (শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)—সমগ্র চেতনের মূল চেতন সেই শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ-কমলে রতি উৎপাদন হয়, এরূপ যাবৎ গ্রন্থ—সকলই 'শাস্ত্র'। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের লিখিত সকল গ্রন্থই যে শাস্ত্র, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার অপরদিকে শ্রীচৈতন্য-বিরোধিগণের উদ্‌গীর্ণ যাবৎ বিষ্ণুনিন্দা-সূচক 'বমন' যে 'কুবর্ত্ম'ই—এতেও কোন সংশয় নেই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধিতামূলক যাবতীয় কদালোচনা, তা সবই 'কুবর্ত্ম'—অচৈতন্যরাজ্য-মুখী পিচ্ছিল প্রবেশ পথ।

## শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীচৈতন্য-বিরোধীগণ

শ্রীচৈতন্য-বিরোধীরা শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর (?), বা অপমৃত্যুর (?) অপপ্রচার করতে অনেক সময়ই তাঁদের পূর্ব্বসূরী-পাষণ্ডকুলের প্রলাপোক্তি প্রমাণ-স্বরূপে উদ্ধৃত করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার তাঁদের সেই

পূর্ব্বসুরীদেরকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সমসাময়িক বলেও উল্লিখিত হতে দেখা যায়। এসব সত্য, কি অসত্য, তা নিরূপণের জন্য অযথা তর্কে না গিয়ে বরং এইমাত্র বলা যায়,—"**শূড়ীর সাক্ষী মাতাল।**"

ভগবদ্বিরোধিতার ইতিহাস বহু প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। বিশেষ করে অসুরদের দমনের জন্যই যখন ভগবানের আবির্ভাব, তখন তাঁর সমসাময়িক অসুরকুলের অস্তিত্বে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নেই। সেইপ্রকার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়েও তাঁর বিরোধী-গোষ্ঠীর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি রাজা প্রতারুদ্রের প্রশ্ন—

"**শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।**
**তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ?**"

(চৈঃ চঃ ২।১১।১০১)

এস্থলে 'পণ্ডিত সব' বলতে তৎকালীন যাবতীয় পণ্ডিতকেই বুঝতে হবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ংই অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, যিনি তৎকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মিরীর সমস্ত অহমিকা মুহূর্ত্তেই নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। আর শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের কথাই বা কি—তাঁরা সকলেই একেক জন মহা-ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিলেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, স্বরূপ দামোদর, মুরারী গুপ্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পরমানন্দ পুরী, হরিদাস ঠাকুর, রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, গোপীনাথ আচার্য্য, নন্দনাচার্য্য, রাঘব পণ্ডিত, মধুসূদন বাচস্পতি, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, ভগবান্ আচার্য্য, শিখি মাহিতি, শ্রীরূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামী, গোপালগুরু, শঙ্কর পণ্ডিত প্রভৃতি কে নন? তাঁদের সেই নিত্য-প্রাতঃস্মরণীয় নাম-সকল উল্লেখ করতে গেলে এক বিশাল মহাভারত রচিত হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, এইসকল মহাভাগবত মহাপণ্ডিতগণের সমকক্ষ সেইকালে সমগ্র ভূ-ভারতে কেউই ছিলেন না। মাৎসর্য্যে উন্মত্ত হয়ে সেই বিতৃষ্ণ 'পণ্ডিত সব' কেবল দূর থেকেই শত আস্ফালন ও সহস্র নিন্দায় মুখর হতেন। তার প্রমাণ—



"**চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণগানে।**
**ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে॥**"(চৈঃ ভাঃ ২।৬।১৭২)

তৎকালে তথাকথিত কিছু 'ভট্ট, মিশ্র, চক্তবর্ত্তী'রা যে মহাপ্রভুর নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন, তাও আশ্চর্য্যজনক কিছু নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—

"**জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।**
**নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥**'(ভাঃ ১।৮।২৬)

বিদ্যা-কুল-রূপ-ধনের মদে যারা মত্ত থাকে, তারা কখনই ভগবানকে লাভ করতে পারে না। ভগবান্ কেবল নিষ্কিঞ্চন নিরভিমানিগণেরই লভ্য।

"**দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।**
**কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড়ই অভিমান॥**"(চৈঃ চঃ ৩।৪।৬৮)

প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বস্তুতঃ কখনই উত্তম-অধম বিচার করেননি—যিনিই তাঁদের সম্মুখে অবনত হয়েছেন, তিনিই নিস্তার লাভ করেছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৫।২০৮-২০৯)—

"প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
**উত্তম, অধম কিছু না করে বিচার॥**
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।"

তৎকালীন যাবৎ 'উত্তম'গণ, সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর অকৃপণ কৃপাভাজন হয়ে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন। যেমন,—

"হাঁসিয়া কাঁদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
**চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি**, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥"

কিন্তু যাঁরা 'উত্তম'-অভিমানী এবং আসুরিক-ভাবেও ভরপুর, তাদের নিয়েই ছিল যত সমস্যা—'বিদ্যা', 'কুলের' মদে মত্ত সেই তাদের পক্ষে একাসনে তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর সাথে নামকীর্ত্তন, প্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি যে অত্যন্ত সম্মানহানিকর! অথচ দেবদুর্ল্লভ 'কৃষ্ণপ্রেম' এইপ্রকারে অকাতরে বিতরিত হতে দেখে এবং সকল শূদ্র, চণ্ডাল এমনকি যবনদেরকেও সেই

কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হতে দেখে তারা বরং আরও ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত হতে লাগলো। অতঃপর মহাপ্রভু এবং তাঁর ভক্তগণের প্রতি এক নিন্দা ছাড়া তাদের আর দ্বিতীয় কোন কৃত্যই রইল না।✶ ''আঙুর ফলই টক''—এইপ্রকার আত্মপ্রবোধ মাত্র অবলম্বন করে আঙুর-সম্বন্ধে সহস্র দুর্গুণ প্রচারেই তারা কালাতিপাত করতে লাগলো।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিজেও এইসকল নিন্দুক-গোষ্ঠীর সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং নিজমুখেই তা ঘোষণা করেছেন,—

''সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
উদ্ধার করিমু সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে-দৈত্য-যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ-যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃষ্ট-দুষ্ট-যবন-চণ্ডাল।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সবারে।
সুর-মুনি-সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥
**বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্যার মদে।**
**যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥**
সেই সব জন হবে এ যুগে বঞ্চিত।
**সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥**''

(চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২০-১২৫)

অতএব দেখা যায়—বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান এবং তপস্যার মদে মত্ত, যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও সেই সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি

✶ ''**করীন্দ্রে ভ্রাজমানেঽপি স্তূয়মানে সুপুরুষৈঃ।**
**বুক্কন্তি সারমেয়াশ্চ কা ক্ষতিস্তস্য জায়তে॥**'' (সিদ্ধান্তদর্পণ)

রাজপথ-পর চলে গজপতি, সুধীগণ দেখি' করে নানা স্তুতি।
কুকুরের দল করে শোরগোল, গজরাজের কি তাতে হয় ক্ষতি??



বিতৃষ্ণ এবং তাঁর ভগবৎচরিত্র অস্বীকার-কারী (''সবে তারা না মানিবে আমার চরিত্র'') সেই সব 'ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী'দের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দার বমন উদ্‌গীরণ রেখে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু সে-সকল বমন নিশ্চয়ই শ্রুতি-স্মৃতিকে অতিক্রম করে প্রমাণরূপে নির্দ্দিষ্ট হতে পারে না। ''**ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে**''—শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি থেকেই তৎকালীন মাৎসর্য্যকাতর নিন্দক-কুলের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। আর বর্ত্তমানে সেই '**ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী**'-দের সুযোগ্য (!) অনুগতেরা পূর্ব্বসূরীদের রেখে যাওয়া সেই 'বমন' গলাধঃকরণ করে যে ঘন ঘন দুর্গন্ধময় ঢেকুর উদ্‌গীরণ করবেনই, তাতে আর আশ্চর্য্যের কি? শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উদ্ধৃত শ্রীবরাহপুরাণের—

''**রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।**
**উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥**''
''**কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-ঘরে।**
**জন্মিবেক সুজনেরে হিংসা করিবারে॥**''

(চৈঃ ভাঃ ১।৬।৩০০)

এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই মাঠে মারা যেতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতির যে-সকল নিন্দাসূচক উক্তি, সে সমস্ত নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রমাণ-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর সে-সকলকেই যদি কেউ প্রমাণ-রূপে স্থির করতে চান, তবে তার আসুরিক-প্রবৃত্তি ও বিকৃত মানসিকতা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। অসৎ রুচির ব্যক্তি কখনই সদ্বস্তু-প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এজন্যই ''**চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী**'', ''**স্বভাব না যায় মলে**'' কিংবা ''**শূকরে চেনে কচু আর ঘেঁচু**''—প্রভৃতি প্রবাদ-বাক্যের উদয় হয়েছে। সেই তাদের কাণ্ডজ্ঞানকে সচেতন করতে শুধু এইমাত্র বলা যায়—শ্রুতি-স্মৃতি-বেদ এবং অন্যান্য ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য যদি প্রমাণ-রূপেই স্বীকৃত না হল, তবে তোমাদের কথারই বা প্রামাণিকতা কোন্ যুক্তিতে গ্রাহ্য?

**"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং, ধর্ম্মার্থযুক্ত-বচনং প্রমাণং।**
**এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং, কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণম্??"**

## শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের রচনা সকলই 'শাস্ত্র'

রাজার পারিষদগণই যেমন রাজকার্য্যের রহস্য জানেন, অন্যেরা (রাজদ্রোহীরা) নয়, সে-প্রকার শ্রীহরির দাসগণই শ্রীহরিকে জানেন, অপর অসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তাঁকে জানতে পারে না—

**"যথৈব নৃপতের্দাসাঃ স্বরাজ্ঞঃ কার্য্যগৌরবম্।**
**জানন্তি নাপরে বিপ্র তথা দাসা হরেঃ স্বয়ম্॥"** (ভবিষ্যপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণের অতুল-মহিমা ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরাদি ভক্তগণ অনুভব করতেন, কিন্তু শিশুপালেরা সমসাময়িক হলেও বিদ্বেষবশতঃ তা উপলব্ধি করতে পারেনি। এইজন্যই কথায় আছে,—"জহুরী জহর চেনে"। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পার্ষদগণই তাঁর ভগবত্তা-সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে তাঁরাই মহাপ্রভুর সেই ভগবত্তা ও ছন্নাবতারত্ব শাস্ত্রপ্রমাণ-সহযোগে সর্ব্ববিশ্বকে জানিয়েছেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরায়-রামানন্দ, শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কবি কর্ণপুর, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণ তাঁদের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ং ভগবত্তা এবং তাঁর অপ্রাকৃত পাষাণদ্রব-কারী লীলামাধুরী প্রকাশ করে গেছেন।

**"তদিদমতি-রহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ**
**খল-সমুদয়-লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।**
**ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ**
**সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি॥"**
(চৈঃ চঃ ২।২৫।২৭৬)

শূকর-জাতির কাছে অমৃত স্বভাবিকভাবেই আদৃত হয় না। সেইপ্রকার অতিরহস্যময় সেই গৌরলীলামৃতও খলগোষ্ঠী আদর করতে পারে না।



সেইজন্য সেই সেই গ্রন্থকারের নিশ্চয়ই কিছুই এসে যায় না, কারণ, সহৃদয় সাধুগণের আনন্দ বিস্তারের জন্যই সেইসব গ্রন্থ প্রণীত—যে লীলামৃত-সরোবরে সাধুগণ তাঁদের মানসহংস নিত্য নিত্য বিহার করিয়ে থাকেন।

**"এসব সিদ্ধান্ত হয় আমের পল্লব।**
**ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥**
**অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।**
**তবে চিত্তে মোর আনন্দ বিশেষ॥"** (চৈঃ চঃ)

কণ্টকভোজী উট আম্রপল্লবের পেলবতায় সুখবোধ করে না, কোমল-স্বভাব কোকিলের কাছেই তা আদরণীয় হয়। মধুমক্ষিকার নিকট মধুই কেবল অনুসন্ধেয়, অপর দিকে মক্ষিকা রক্ত-পুঁজময় ক্ষতের দিকেই মাত্র নিবদ্ধদৃষ্টি। এই সকলই জগতে জীবের দৈব-প্রবৃত্তি ও আসুরিক প্রবৃত্তির পরস্পর পার্থক্যের জ্বলন্ত উদাহরণ—

**"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।** (গীঃ১৬।৬)

দৈবপ্রবৃত্তি-সম্পন্নগণের জন্যই যত শাস্ত্রবাণী, অসুরস্বভাব-বিশিষ্টদের জন্য নয়। কারণ,—

**"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরা সুরাঃ।**
**ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥"** (গীঃ১৬।৭)

আসুর স্বভাবের ব্যক্তি কখনও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপা ধর্ম্মভেদের ধার ধারে না—শৌচ, সদাচার ও সত্য তাদের কখনই অনুশীলনীয় নয়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যারা অসংযমী, অভক্ত, অশুশ্রূষু ও ভগবৎ-তত্ত্বে অসূয়াপরায়ণ, তাদের কাছে শাস্ত্রোপদেশ নিষেধ করে দিয়েছেন।

**"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।**
**না চাশুশ্রুষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"** (গীঃ ১৮।৬৭)

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের বিরচিত যাবতীয় লেখনীই 'শাস্ত্র'-রূপে সম্মাননীয়। এই 'প্রসঙ্গে'র প্রারম্ভেই 'শাস্ত্র' কি, কি তার তাৎপর্য্য—তা তুলে ধরা হয়েছে। আসুর-স্বভাবের লোকেরা কখনই 'শাস্ত্রে'র আদর করে না।

যেমন, চোর, ডাকাত, খুনীদের কাছে 'আইন-কানুন'-গ্রন্থের আদর থাকে না। 'আইন-আদালত' দেখলে তাদের বরং গোস্‌সা হয়। কিন্তু তাতে কি সে-সব অপ্রামাণিক হয়ে যায়? ঠিক তদ্রূপ।

## শ্রীচৈতন্য-লীলার মূল প্রামাণিক গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্য-পার্ষদগণের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারিত্ব, অবতার-তাৎপর্য্য, লীলা, লীলা-তাৎপর্য্য, তৎকালীন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কবিকর্ণপুর, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটকালীন ভক্তগণের রচনাই পরবর্ত্তী সকল সুধীগণের নিকট শ্রীচৈতন্য-লীলার পঞ্জী ও দিগ্‌দর্শনরূপে সমাদৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে শ্রীমুরারীগুপ্ত-কৃত ''শ্রীচৈতন্যচরিত'' ও ''শ্রীস্বরূপ-দামোদর-কড়চা'ই গৌরলীলার পথিকৃৎ-রূপে শ্রীকবিকর্ণপুর, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের কনিষ্ঠ পার্ষদগণের নিকটেও বিশেষ সম্মানিত হয়ে থাকেন। সেইসকল পার্ষদগণ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন, স্পর্শন ও কৃপালাভে নিত্য পরিপুষ্ট—সুতরাং তাঁরা যে শ্রীচৈতন্য-কাব্য রচনায় বাস্তবপন্থী হবেন, এতে সংশয় বা বিস্ময়ের কিছুই নেই।

শ্রীগৌরচন্দ্রের পরম প্রণয়ী ভক্ত শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীপরমানন্দপুরী দাসই সুধীসমাজে 'কবি কর্ণপূর'-নামে সমধিক পরিচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে ধারণের সৌভাগ্যাতিশয্যে তিনি সাত বৎসর বয়সেই তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব এক শ্লোক রচনার মাধ্যমে শ্রীহরির রূপ-গুণ-কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। ১৪৬৪ শকে অর্থাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের নবম বর্ষে তাঁর ''শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্'-গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয় এবং ১৪৯০ শকাব্দে তাঁর ''শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্'' রচিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনাকালে অনেকাংশে সেই নাটকটীকে অনুসরণ করেছেন এবং প্রমাণরূপে অনেক শ্লোক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত নাটকের ৮ বৎসর ব্যবধানে শ্রীকর্ণপুর



''গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'' রচনা করেন। তাঁর এইসকল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে প্রমাণ-ভাস্কররূপে গৌড়ীয় গগনে চির উদিত হয়ে আছেন।

মহাপ্রভুর কনিষ্ঠ পার্ষদগণের মধ্যে বিশেষ করে শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীই সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর শ্রীস্বরূপের আনুগত্যে মহাপ্রভুর বিভিন্ন অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। পরমসেব্য সেই প্রাণারামের অন্তর্দ্ধান এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীস্বরূপেরও অপ্রকট ঘটলে অসহনীয় বিরহ-যাতনায় শ্রীরঘুনাথ গোবর্দ্ধনে দেহপাত করার মানসে বৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ-সনাতন বিরহ-বিধুর শ্রীরঘুনাথকে সেই কার্য্য থেকে বিরত করে 'তৃতীয় ভাই'-রূপে নিকটে রাখলেন এবং তাঁর মুখে তখন মহাপ্রভুর অন্তর-বাহির সকল লীলা শ্রবণ করে তাঁরা তাঁদের তৃষিত কর্ণ সদা সিঞ্চিত করতেন।

''মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথ দাস। সর্ব্বত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে। প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন। স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥
এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে। আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥''

(চৈঃ চঃ ১।১০।৯১-৯৭)

'শ্রীস্বরূপ-দামোদর-কড়চা' সুপরিচিত হলেও দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু 'স্বরূপের রঘু' বলে সুপরিচিত শ্রীরঘুনাথেরই কণ্ঠে তা রক্ষিত হওয়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীরঘুনাথ-অনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারাই জগতে প্রচারিত হয়। পৃথক্ পুস্তকাকারে বর্ত্তমানে যে কোথাও কোথাও সেই কড়চা দেখা যায়, তা কিছু স্বরূপ-বিরোধী বিরূপগ্রস্তদের উপদ্রব-বিশেষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই বস্তুতঃ শ্রীস্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।

**''চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাঁহা ইঁহা বিস্তারিলুঁ, ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে॥''**

(চৈঃ চঃ ২।২।৮৪)

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু তথাপি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরকেই 'শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস' বলে ঘোষণা করেছেন—

**"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।**
**চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥"** (চৈঃ চঃ ১।৮।৩৪)

নিজকে সেই শ্রীব্যাসাবতারের উচ্ছিষ্টভোজি-রূপে বর্ণনা ক'রে তিনি তাঁর রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবতকে' সর্ব্বমঙ্গল ও ভক্তিসিদ্ধান্তের খনিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল লীলা তাঁর দ্বারা বর্ণিত হয়নি বা বিস্তারিত হয়নি, সে-সকল অংশই বিশেষতঃ শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর গ্রন্থে সবিস্তারে সংরক্ষণ করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ প্রকটকালীন ভক্ত না হলেও স্বরূপতঃ তিনি তাঁর নিত্যলীলারই সঙ্গী। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবনে গমন ক'রে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য পার্ষদগণ যেমন, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, মহাপ্রভুর নিজ-রূপ শ্রীরূপ গোস্বামী, মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গ-সান্নিধ্যে শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত-ধারায় অভিষিক্ত হন। অতঃপর বৃন্দাবনবাসী গৌরভক্তগণ যেমন শ্রীঅনন্তাচার্য্য-শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত, মহাপ্রভুর সেবক শ্রীকাশীশ্বর-প্রভুর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী, শ্রীরূপ-গোস্বামীর সঙ্গী শ্রীযাদবাচার্য্য, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীচৈতন্যদাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁকে শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ করে অন্ত্য-লীলা বর্ণনের আদেশ প্রদান করেন। বার্দ্ধক্যে অবনত তিনি নিজের সেই বিষয়ে অধিকার ও সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য স্বয়ং শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহের চরণান্তিকে এসে উপনীত হলেন। শ্রীগোসাঞিদাস-নামক পূজারী তদনুসারে শ্রীবিগ্রহ-চরণে গ্রন্থ-রচনার আজ্ঞা প্রার্থনা করলে বিগ্রহ-কণ্ঠ হতে মালা খসে পড়ল। আনন্দে উল্লসিত বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনিতে মুখরিত সেই পরিবেশে পূজারী সেই আজ্ঞামালা শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভুর গলদেশে পরিয়ে দিলেন।



**"আজ্ঞামালা পাঞা আমার হৈল আনন্দ।**
**তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥**
**এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।**
**আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥"** (চৈঃ চঃ ১।৮।৭৭-৭৮)

এই কারণেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সকল শ্রীচৈতন্যভক্ত তথা সর্ব্ব সুধীগণের নিকট অত্যন্ত প্রামাণিকরূপে বিবেচিত হয়।

**"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে।**
**সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"** (চৈঃ চঃ ২।৬।৮৩)

ঈশ্বর-কৃপা বিনা যে কোন সৃষ্টি এক অনাসৃষ্টি বিশেষ। শ্রীব্যাসদেব যেমন চিৎসমাধি-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি দর্শন ক'রে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেছেন, সেইপ্রকার অনুভবী ব্যক্তিগণের মতে শ্রীকৃষ্ণদাস-প্রভুও শ্রীমদনমোহনের কৃপাপ্রভাবে শ্রীগৌরলীলা সন্দর্শন করেই বর্ণন করেছেন।

**"প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন, সর্ব্ব চিত্ত নারি আরাধিতে॥**
**নাহি কাঁহা সবিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ, সহজবস্তু করি বিবরণ।**
**যদি হয় রাগ-দ্বেষ, তাঁহা হয়ে আবেশ, সহজ বস্তু না যায় লিখন॥"**
(চৈঃ চঃ ২।২।৮৫-৮৬)

তিনি কারও সাথে বিরোধ বা কারও অনুরোধের বশবর্ত্তী হয়ে কিছু লেখেননি, কিংবা কোন জড়ভোগ বা দ্বেষাবেশেও তাঁর সহজ লেখনী প্রভাবিত হয়নি। কে তাঁর প্রশংসা করবেন বা কে রুষ্ট হবেন—এইভাবে সমস্ত চিত্তের আরাধনা না ক'রে মহাপ্রভুর যে-প্রকার আচরণ, তার সহজ বর্ণনেই তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। তজ্জন্য তিনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-পর্য্যন্ত অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর কৃত 'সূত্র' ও 'বৃত্তি'কেই মুখ্যরূপে অবলম্বন করেছেন।

**"স্বরূপ গোস্বাঞি আর রঘুনাথ দাস।**
**এই দুইর কড়চাতে ও লীলা প্রকাশ॥**

**সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।**
**আর সব কড়চা কর্ত্তা রহেন দূরদেশে॥**
**স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।**
**তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার॥**"(চৈঃ চঃ ৩।১৪।৭-১০)

সুতরাং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিরপেক্ষতা ও তাঁর গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা সংশয় উৎপন্ন হতে পারে না। জড়বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব গবেষকেরা এইসকল গ্রন্থে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাদের অনুসন্ধেয় পাঞ্চভৌতিকতা বা তদ্ধর্ম্মগত নশ্বরতার পুতিগন্ধ পান না বলে হতাশ হয়ে পড়েন—সে-সব গ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্যতায় সংশয় প্রকাশ ক'রে বরং তাদের নাসিকার যোগ্য গন্ধ অনুসন্ধানেই সকল বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ নিযুক্ত করেন। তখন শ্রীচৈতন্য-বিরোধীদের অর্থাৎ 'শিশুপাল'দের উদ্গীর্ণ বমন-মধ্যেই তারা বিশ্রাম লাভ করেন। সুধীগণ তাঁদের এহেন দুর্দ্দশা-দর্শনে দুঃখী না হয়ে পারেন না।

## জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

শ্রীজয়ানন্দ ও তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-সম্বন্ধে যথা সম্ভব দুই-একটী কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ, বর্ত্তমান ও কিছু পূর্ব্বেরও পাষণ্ডকুলের উপজীব্য শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতা এই পুঁথি থেকেই মূলতঃ সিদ্ধ হয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, সেই পুঁথি নাকি মহাপ্রভুর তিরোধানের মাত্র ৭ বৎসর পর রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটী যে একটী জালগ্রন্থ-বিশেষ, তা এই প্রসঙ্গে প্রমাণিত হবে। শ্রীগৌরপার্ষদ খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের প্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত বিষয়ক গ্রন্থটীই মূলতঃ 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-নামে প্রসিদ্ধ। জয়ানন্দের পরে শ্রীলোচন গ্রন্থ রচনা করলে নিশ্চয়ই তাঁর গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রাখতেন না। শ্রীলোচনদাস প্রভুর সমকালীন ঠাকুর শ্রীশ্রীল বৃন্দাবনদাসের রচিত গ্রন্থও যে এক সময়ে 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-নামে পরিচিত ছিল, তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়।—



**"বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।**
**যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥"** (চৈঃ চঃ ১।৮।৩৫)

কিন্তু কোন গ্রন্থের একইপ্রকার নামকরণ প্রথা-বিরুদ্ধ বলেই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পরে তাঁর গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করে "শ্রীচৈতন্যভাগবত" রেখেছিলেন—এরূপ এক প্রবাদ আছে। সুতরাং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' মহাপ্রভুর তিরোধানের পর পরই রচিত হয়ে থাকলে শ্রীলোচনদাস ঠাকুর কখনই তাঁর গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রাখতেন না।

জয়ানন্দ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন বৈষ্ণব বা মহাপ্রভুর অনুগত কোন বিশেষ জন হন, তবে তাঁর নাম কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখা যায় না কেন? মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে-সকল ভক্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অনেকটা এবং বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শাখাপর্য্যায়-ক্রমে বিশদ বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্ত্তী গৌড়ীয়াচার্য্যগণের এবং প্রকট-কালীয় যে-সকল ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তা শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর রচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! কুত্রাপি জয়ানন্দের নামোল্লেখ নেই। শ্রীমৎ দেবকীনন্দন দাস তাঁর 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' কোন প্রসিদ্ধ ভক্তের নাম বাদ দেননি; তিনি কিভাবে বৈষ্ণবগণের নাম সংগ্রহ করেছিলেন, তা তাঁর নিজ উক্তিতেই বর্ণিত হয়েছে—

**"বৈষ্ণব গোঁসাঞির নাম উদ্দেশ-কারণ।**
**নানা ক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু গমন॥**
**যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে।**
**যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥**
**শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।**
**সর্ব্ব প্রভুর নাম-মালা গ্রন্থন করিনু॥"**

এত নিপুণ অনুসন্ধানমূলক বন্দনায়ও জয়ানন্দের নাম কোথায়? সুতরাং জয়ানন্দ যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব

ছিলেন না—তা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। বরং তাঁর গ্রন্থের ভাষা, সিদ্ধান্ত ও বর্ণনা প্রভৃতি দ্বারা সহজে বুঝা যায় যে—তা অশ্বঘোষীয় মহাজান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের কল্পিত আধুনিক পুস্তক বিশেষ। শাস্ত্রে অকুণ্ঠভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণ পরমপবিত্র হরিকথামৃতও সর্পের দ্বারা উচ্ছিষ্ট দুগ্ধের মতই পরিত্যজ্য,—

**''অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্**
**শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্ট যথা পয়ঃ॥''**(পদ্মপুরাণ)

এখন জয়ানন্দকে মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলে মনে করা যাক্—যে-কারণে কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাঁর নামোল্লেখ নেই এবং যিনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের ৭ বৎসর পর সেই অসদ্বার্ত্তাবহ 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদগণ এবং সেই পার্ষদাশ্রিত ভক্তগণের উপস্থিতিতে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে জয়ানন্দ বিভিন্ন অশাস্ত্রীয় কথা এবং অসত্য ভাষণ অবাধে পরিবেশন করে যাবেন—এমনটী সূর্য্যের পশ্চিম দিশায় উদিত হওয়ার মতোই অসম্ভব। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর গ্রন্থে সেইসময়ে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-বিরোধী, তথা ভগবৎ-তত্ত্ববিরোধী যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত, অনাচার, অপবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সিংহের ন্যায় ভীষণভাবে গর্জ্জে উঠেছেন। এহেন যাবৎ কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত অপসারণকারী সেই গ্রন্থে কিংবা তাঁর সমসাময়িক কিংবা পরবর্ত্তিকালের কোন বৈষ্ণব-গ্রন্থেই জয়ানন্দের অসদ্বার্ত্তার কোন নিন্দা-প্রতিবাদ দেখা যায় না। 'তৃণাদপি সুনীচ' এবং একই সাথে শ্রীমদ্ভাগবতীয় মন্ত্রে✶ দীক্ষিত 'বজ্রাদপি কঠোর' সেই পাষণ্ডদলনকারী গৌরভক্তগণের পক্ষে এইপ্রকার অমার্জ্জনীয় অন্যায়ের

✶ **কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।**
**ছিন্দাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥''**
(ভাঃ ৪।৪।১৭)

''মহাজন-নিন্দা যথা শুনি নিজ কানে। হাতে কান ঢাকিয়া চলিব তথা হনে॥
যদি পারি তা'র জিহ্বা কাটিয়া ফেলিব। নহে বা আপন প্রাণ আপনে ছাড়িব॥''
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী)



প্রশ্রয়-দান বা অসামর্থ্য-প্রসূত মৌনাবলম্বন কখনই সম্ভব নয়—তাঁদের সম্বন্ধে এইপ্রকার কল্পনাও ভীষণ অপরাধজনক। সুতরাং কোনভাবেই জয়ানন্দকে মহাপ্রভুর সমসাময়িকরূপে বিবেচনা করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের অবৈধ প্রতিযোগিরূপে যেমন 'দেবীভাগবত' জড় শাক্তেয়বাদিগণের দ্বারা রচিত হয়েছিল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও যে ঐপ্রকার ঈর্ষামূলেই অনেক পরে রচিত হয়েছে, এতে কোন সংশয় না। এইপ্রকার গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' না হয়ে বরং জীবের চৈতন্যোদয়ের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক বলে **'চৈতন্যামঙ্গল'**-নাম হওয়াই যুক্ততম।

## শ্রীলোচন-দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'

শ্রীগৌরপার্ষদ খণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট একটী অন্যতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে আদৃত হয়ে থাকে। উক্ত গ্রন্থের কিছু আধুনিক সংস্করণে মাত্র আষাঢ় মাসে গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার বর্ণনা দেখা যায়। অচিন্ত্যশক্তিমান ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়া নিশ্চয়ই অসম্ভব কিছুমাত্র নয়; তথাপি যথার্থ বিচারে উক্ত অংশের আধুনিকতাই প্রমাণিত হয়ে থাকে। বিশেষতঃ গ্রন্থকার স্বয়ংই শ্রীমুরারি গুপ্তের 'শ্রীচৈতন্যচরিতকে' তাঁর গ্রন্থের আকররূপে নির্দ্দেশ করায় উক্ত লীন হওয়ার আখ্যানটী প্রক্ষিপ্ত বলেই বিচারিত হয়। ''শ্রীগৌড়ীয় মঠ'' হতে ''শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের প্রথম এবং পরিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেও শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়ের দ্বারা উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত হতে দেখা যায়। সেই গ্রন্থের শেষ খণ্ডের শেষভাগে (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায়) সম্পাদক-কৃত পাদটীকায় দেখা যায়—
*''একখানি (সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীর) পুঁথিতে এবং ১৭৭৪ শকাব্দায় মুদ্রিত পুস্তকে এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্তি হইয়াছে। নিম্নলিখিত পদ্যগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত গ্রন্থে এবং একখানি আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের সহিত আধুনিক হস্তলিখিত পুঁথিখানির পাঠে অনৈক্যও আছে।''*

সম্পাদক-কথিত সেই 'নিম্নলিখিত পদ্যগুলির' মধ্যেই উক্ত লীন হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।

পুনরায় ঐসকল পদ্যগুলির শেষভাগে দেখা যায়,—মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রবেশ করলে পর মন্দিরের দ্বার ভিতর থেকে আপনা হতে বন্ধ হয়ে গেল। তখন বহির্দ্বারে—

"*কাশীমিশ্র, সনাতন আর হরিদাসে।*
*উৎকলের সভে কাঁদে ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥*"

দ্বারদেশে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর এই নামের তালিকা হতেও দেখা যায় যে, উক্ত গ্রন্থে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান' অংশটী পরবর্ত্তী কোন লিপিকার-দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কারণ, মহাপ্রভুর অপ্রকট-সময়ে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী নীলাচলে ছিলেন না—তিনি শ্রীবৃন্দাবন-ধামেই অবস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একবার মাত্র শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নীলাচল-ধামে গমনের উল্লেখ দেখা যায় এবং মহাপ্রভুর প্রকটকালেই তিনি তাঁর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বৃন্দাবন-দর্শনে আগত শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে আগমনের সংকল্প শ্রবণ করেন ও তজ্জন্য তিনি মহাপ্রভুর বাসস্থান-নির্ণয়ের আদেশও লাভ করেন। তদনুসারেই তিনি বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর প্রতিক্ষায় অবস্থান করছিলেন। অপরদিকে, শ্রীসনাতন গোস্বামীর দ্বিতীয়বার নীলাচল গমন অন্য কোন গ্রন্থদ্বারাও সমর্থিত হয় না। সুতরাং মহাপ্রভুর অপ্রকটকালে নীলাচলে সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপস্থিতি নিতান্তই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ নীলাচলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে দুইজন 'হরিদাসের' বিশেষ নামোল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে সর্ব্বজন-বিদিত সুপ্রসিদ্ধ নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু স্বয়ংই সমুদ্র-তটে সমাধি দিয়েছিলেন। সে-সমাধি-মন্দির এবং সেবা অদ্যাপি পুরীর সিন্ধুতীরে প্রকট আছে। দ্বিতীয় যে হরিদাস, তিনি 'ছোট-হরিদাস' নামেই খ্যাত ছিলেন। প্রকৃতি-সম্ভাষণ-জনিত অপরাধে মহাপ্রভু তাঁকে বর্জ্জন করায় তিনি মহাপ্রভুর প্রকটকালেই প্রয়াগে ত্রিবেণী-



সঙ্গমে দেহ-বিসর্জ্জন করেন। সুতরাং মহাপ্রভুর জগন্নাথে লীন হওয়ার সময়ে দ্বারদেশে কোন হরিদাসের উপস্থিত থাকা একেবারেই অসম্ভব। অতএব এইসব লক্ষণে উক্ত অংশ যে যথার্থ অতিরিক্ত, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বরং এই একটী সৎ-অনুমানে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, জয়ানন্দের 'চৈতন্যামঙ্গলে' বর্ণিত আষাঢ় মাসে রথযাত্রাকালে ইষ্টক-খণ্ডের আঘাতে মহাপ্রভুর 'মায়ার শরীর' পরিত্যাগের অসৎতম বার্ত্তার সাথে প্রতিযোগিতা-মূলেই হয়ত' পরবর্ত্তিকালে শ্রীলোচন-দাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'-মধ্যে আষাঢ় মাসে রথযাত্রাকালে গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার আখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে। 'বিষে বিষক্ষয়' কিংবা 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা' প্রভৃতি রীতি-নীতি থাকলেও জয়ানন্দের অ-তথ্যের অপ্রামাণিকতা তুলে ধরতে গৌর-পার্ষদগণের লেখনীসকলই যথেষ্ট—সেজন্য অপর এক অসৎ পন্থাশ্রয়ের আবশ্যকতা অবশ্যই নেই।

## শ্রীমাধব পট্টনায়েকের নামে জালগ্রন্থ-রচনা

সম্প্রতি শ্রীচৈতন্য-বিরোধীরা তাঁদের সৃষ্ট যাবতীয় প্রাচীন গল্পগুলিকে পক্ষান্তরে ভুল ব'লে জ্ঞাপন ক'রে নূতন এক বিরোধিতার গল্প খাড়া করেছেন। কোন এক শ্রীপাণ্ডা তাঁর শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার নিদর্শনরূপে সম্প্রতি "**শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব্ব**"-নামক এক নূতন উৎপাত আমদানি করেছেন। সেখানে শ্রীমাধব পট্টনায়ক-বিরচিত কোন "**বৈষ্ণব-লীলামৃত**"-পুঁথির বিষয়বস্তু তাঁর চৈতন্য-হীনতার সাথে বিশেষ ছন্দোবদ্ধ হতে দেখা যায়। উক্ত পুস্তকের '*সবিনয় নিবেদনে*' শ্রীপাণ্ডা 'ভক্তিবাদী রচনাগুলোর অন্তর্গত অলৌকিক কাহিনীর বহুলতা'কে তাঁর গবেষণার চির বাধারূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, অলৌকিকতাটী মানুষের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু আজন্ম কূপে আবদ্ধ ব্যাঙের মতো সসীম ও লৌকিক বিচারপর কা'রও পক্ষে অসীম, অলৌকিকের প্রতি অযথা কৌতুহলী হওয়া যে কতখানি অসমীচীন ও হাস্যকর, তা দুর্ভাগ্য! পাণ্ডাজীরা আজও বুঝতে পারেন নি।

শ্রীপাণ্ডার আবিষ্কৃত ''*বৈষ্ণব-লীলামৃত*''-মধ্যে শ্রীমাধব পট্টনায়ক শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর শিষ্যরূপে বর্ণিত হয়েছেন। তার উপর তিনি নাকি শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর 'ছায়া'। সুতরাং এহেন বিশেষ নাম অন্ততঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'গদাধর-শাখায়'-বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন বৈষ্ণবগণ হীন প্রাদেশিকতায় নাকি আক্রান্ত (!) থাকায় শ্রীপট্টনায়কের উক্ত গ্রন্থে স্থান হয়নি। 'স্বরূপের রঘু'-র মত শ্রীরামানন্দের সেই 'ছায়া' (?) কেন যে সুপরিচিত হতে পারেননি, তার সদুত্তর কিছুতেই পাওয়া যায় না। যা হোক শ্রীদেবকীনন্দন দাস অবশ্য তাঁর 'বৈষ্ণব-বন্দনায়' কোন এক শ্রীমাধব-পট্টনায়ককে অন্তর্গত করে পাণ্ডাজীদের কল্পিত সেই প্রাদেশিকতার অপবাদকে অপসারণ করেছেন। সেই বৈষ্ণব-বন্দনায় শ্রীপট্টনায়ক-সম্বন্ধে ''**বন্দো পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম**''—এইমাত্র বর্ণনা দেখা যায়। প্রাদেশিকতার দোহাই দেওয়া ছাড়া পাণ্ডাজীদের আর কোন গত্যন্তর নাই। যিনি শ্রীগদাধর প্রভুর শিষ্য ও তদুপরি শ্রীরামানন্দ প্রভুর 'ছায়া', তাঁর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতকারগণ উন্নাসিক ছিলেন, এ কথা সূর্য্যের পশ্চিমদিকে উদয় হওয়ার মতোই অসম্ভব। যাই হোক্—'বৃক্ষ তোমার নাম কি?' 'ফলে পরিচয়'—এই লক্ষণেও পাণ্ডাজীর আবিষ্কৃত এই চরিত্রটীর যথার্থতা কতখানি, তা উপলব্ধ হয়।

(**অসঙ্গতি—১**) শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের ২ বৎসর পর (?) এবং মূলতঃ তাঁর সম্বন্ধেই রচিত হওয়া পুঁথির নামকরণ 'বৈষ্ণব-লীলামৃত' হওয়াটীও অত্যন্ত অসামঞ্জস্যকর। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে তাঁর অন্যান্য পার্ষদগণের রচিত গ্রন্থসমূহের নামকরণ লক্ষ্য করলে উক্ত অসামঞ্জস্যটী প্রকট হয়ে উঠে। শ্রীমুরারিগুপ্তের 'শ্রীচৈতন্যচরিত', শ্রীকবি কর্ণপূরের 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্', 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ- দীপিকা', শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতির পাশে 'বৈষ্ণব-লীলামৃত' নামকরণ যে 'কানা



গরুর ভিন্ন গোঠের' মতোই অত্যন্ত বিসদৃশ হবে—এতে আর সন্দেহ কি? 'শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত' না হয়ে 'বৈষ্ণব-লীলামৃত' নামকরণটী যে বিশেষ অভিসন্ধিমূলেই, তাও স্পষ্ট। অর্থাৎ এস্থলে শ্রীচৈতন্যদেবকে তৎকালীন একজন বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন বৈষ্ণবরূপে প্রতিপাদন করাই তাঁদের লক্ষ্য। তারই নমুনা দেখা যায়, 'লীলামৃত'-কারের মহাপ্রভুর সম্বন্ধে '*সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমানে*' বর্ণনায়। এই উক্তি-দ্বারা আদৌ শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রতিপাদিত হয় না—বিশেষ ঐশ্বরিক তেজঃসম্পন্ন উচ্চাধিকারী একজন বিশেষ বৈষ্ণবেরই ধারণা হয় মাত্র। সেটী পাণ্ডাজীও সানন্দে লক্ষ্য করেছেন—''*তাঁর রচনার মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রবল প্রয়াসই নেই।*'' (পৃঃ ১১০)। বস্তুতঃ এইজন্যই তিনি এই অসারকে সার করতে এত উঠে পড়ে লেগেছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ও শ্রীরায় রামানন্দ প্রভুর 'ছায়া'র নিকট থেকে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এইপ্রকার বর্ণনা যে কতখানি বেমানান, তা অতত্ত্বজ্ঞ পাণ্ডাজী কিভাবে বুঝবেন? যেস্থলে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য তাঁর শ্যালক শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাছে শাস্ত্রীয় প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডার মাধ্যমে মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও যুগাবতারত্ব প্রমাণ করেছিলেন, সেস্থলে শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভু ও শ্রীরায়রামানন্দ প্রভুর পক্ষে তাঁদের শিষ্যের কাছে মহাপ্রভুকে বৈষ্ণবত্বে স্থাপন করানোর কথা কি স্বপ্নেও ভাবা যায়? শ্রীমুরারিগুপ্ত হতে আরম্ভ ক'রে সকল চরিতকারগণ তাঁদের গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যদেবের স্বয়ং ভগবত্তা (এমনকি তা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহযোগেও) বর্ণনা করেছেন, দেখা যায়। সুতরাং ঐ 'লীলামৃতের' গোড়াতেই যখন গলদ — তখন তার ফুল-ফল যে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদযুক্ত হবেই, এতে কোন সংশয়ই থাকে না। শ্রীপাণ্ডার আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা এখানেই ইতি করলে যথেষ্ট হয়—কিন্তু তাঁদের চিরলালিত পাষণ্ডতা ও লুক্কায়িত কপটতায় বিশেষ আলোকপাতের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সময়ক্ষেপণকর বিশদ আলোচনায় না গিয়ে দিগ্‌দর্শনরূপে মাত্র কিছু আলোচনার দ্বারাই 'লীলামৃত'-পুঁথির নির্ল্লজ্জ জালিয়াতি ও শ্রীপাণ্ডার দুরভিসন্ধি স্পষ্টীকৃত হবে।

(**অসঙ্গতি**—২) পাণ্ডাজীর গবেষণায় শ্রীমাধব-রথ রচিত 'শ্রীচৈতন্য-বিলাস' নামক অপর এক পুঁথিও উল্লেখিত হয়েছে। পাণ্ডাজীর ধারণায় এই শ্রীমাধব রথ ও শ্রীমাধব পট্টনায়ক একই ব্যক্তি। কিন্তু "**কহই মাধব রথ করিয়া রোদন। সমস্ত ঈশ্বর সে শচীর নন্দন॥**"—এই উক্তি থেকে অন্ততঃ শ্রীমাধব রথকে কখনই 'বৈষ্ণব-লীলামৃতে'র রচয়িতা শ্রীমাধব পট্টনায়েকের সাথে এক করা যায় না। কারণ, "**সমস্ত ঈশ্বর সে শচীর নন্দন**" এবং "*সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমানে*"—এ উভয়ের অর্থ কখনই এক নয়। প্রথমটীতে শচীনন্দনের সমস্ত ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ সর্ব্ব-অবতারিত্বই ঘোষিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টীতে আছে মাত্র ঈশ্বরের সাথে তুলনা। এই উভয়ের বক্তা যে কখনই এক নয়, তা যে-কোন শাস্ত্রবিদ্ উপলব্ধি করেন। বিশেষ করে শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর শিষ্যের পক্ষে ঐ দুই গ্রন্থ রচনার ব্যবধানে এইপ্রকার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটা পাণ্ডাজীর জন্য কোন ব্যাপার না হলেও তত্ত্ববিদ্গণ তা কখনই মেনে নিতে পারবেন না। উক্ত ২ পুঁথির মধ্যে ভাষা ও ভাব-গত ভিন্নতাও—স্পষ্ট। তথাপি শ্রীপাণ্ডা তেল ও জলের মিলনের অপপ্রয়াসের মতোই 'রথ' ও 'পট্টনায়কের' একীকরণে যে প্রবৃত্ত হলেন, এতে এবং আরও যে-সব ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়—পাণ্ডাজীর আদৌ কোন তত্ত্বদর্শনের আলোচনাই নাই। তিনি কেবল তাঁর বৈষ্ণব-বিদ্বেষ মাত্র চরিতার্থ করেছেন।

(**অসঙ্গতি**—৩) শ্রীপাণ্ডা 'বৈষ্ণব-লীলামৃত'-কারের '*বৈষ্ণব-জনোচিত বিনয় অননুকরণীয়*" (পৃঃ ৩৫) বলে বর্ণনা করেছেন। মর্কটের অনুকরণ-প্রবণতা এবং শুদ্ধ ভক্তগণের মহাজনপন্থার অনুসরণ-প্রবৃত্তি যে পৃথক্, তা অভক্তি-মার্গী পাণ্ডাজী কিভাবে বুঝবেন? অতত্ত্বে বিলাসরত ব্যক্তির পক্ষে যে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য, তা প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের তাড়নায় মর্কটোচিত অনুকরণ-বৃত্তিরই ফল—তত্ত্বাশ্রয়ী শুদ্ধভক্তগণ সেই বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবেই পরিহার করেন। সর্পে রজ্জুভ্রমের মত পাণ্ডাজী শ্রীপট্টনায়েকের বিনয়কে '*বৈষ্ণব-জনোচিত*' মনে করে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে চাইলেও তা বস্তুতঃ



'অতিভক্তি'র মতই গর্হণীয়। সাধারণ জনজীবনেও '*অতিভক্তি চোরের লক্ষণ*'-বিচারে তা নিন্দনীয় হয়ে থাকে। এমনকি, শাস্ত্রেও এইপ্রকার অতিভক্তিকে বিশেষ তিরস্কার করা হয়েছে—

"**শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।**
**ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥**" (ব্রহ্মতর্ক)

অর্থাৎ, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রে যে-সব বিচারের কথা বলা হয়েছে, তা উল্লঙ্ঘন ক'রে যতই হরিভক্তি করা হোক্ ও তা বাহ্য দৃষ্টিতে যতই ঐকান্তিকী মনে হোক্, প্রকৃতপক্ষে তা কেবল উৎপাত বিশেষ। সুতরাং সেই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ঘোষিত যে মহাপ্রভুর ভগবত্তা, তাকে অস্বীকার করে যতই '*ঘু দীন মাধব পামর*' বলা হোক্, তা কখনই বৈষ্ণব-সুলভ দৈন্য নয়—শুদ্ধভক্তগণ কখনই তাতে মোহিত হন না।

বরং এস্থলে উক্ত 'বৈষ্ণব-লীলামৃতে'র রচনাকার-রূপে 'শ্রীমাধব পট্টনায়কে'র স্থলে '**মাধব পামর**' নাম-গ্রহণই উপযুক্ত। 'বৈষ্ণব-বন্দনা'য় উল্লেখিত 'শ্রীমাধব পট্টনায়ক'-নামক বৈষ্ণব-ঠাকুরকে উক্ত জাল-গ্রন্থের রচয়িতা ভাবলে বৈষ্ণবাপরাধই হবে। আমরা বরং এস্থলে '**মাধব পামর**' নামেই উক্ত গ্রন্থকারকে চিহ্নিত করবো। এটা কোন বৈষ্ণবোচিত ভূষণ নয়; এই জঘন্যতম কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে ভগবৎপ্রেরণায় নিজের দ্বারা অপকর্ম্মের স্বীকার-মূলেই উক্ত নাম-প্রকাশ।

(**অসঙ্গতি**—৪) শ্রীপাণ্ডাজীর আরও একটী অভিনব গবেষণা—"*ওড়িষ্যার যে-সব চৈতন্যভক্ত ব্রজের ভজন-প্রণালী গ্রহণ করেননি, তাঁদের কারও নামই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে নেই। তাছাড়া গৌড়ীয় এবং উৎকলীয় ভক্তদের মধ্যে যে বিরোধ ছিল এটীও ঐতিহাসিক ঘটনা।*" (পৃঃ১৫)। তাহলে ওড়িষ্যার যে-সব শ্রীচৈতন্যভক্তগণ ব্রজের ভজন-প্রণালী গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম নিশ্চয়ই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। সেস্থলেও যদি '*গোপীভাবে কৃষ্ণে ভক্তি অর্পণ*' করা সেই লীলামৃত-কারের নাম দেখা না যায়, তবে গবেষকজীর উক্ত পুঁথির সততা ও সত্যতা নিয়েই সন্দেহ করা

উচিত ছিল না কি? আর, গৌড়ীয় এবং উৎকলীয় ভক্তদের মধ্যে বিরোধ! অহো 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'! যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাবে ঝারিখণ্ডের ব্যাঘ্র-মৃগও পরস্পর খাদ্য-খাদক-ভাব পরিত্যাগ ক'রে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়,✶ যবনগণ হিংস্র-স্বভাবমুক্ত হন, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পরস্পর উচ্চ-নীচ ভাব বর্জ্জন ক'রে প্রেমালিঙ্গনে রত হন, সেই মহাপ্রভুর স্বয়ং উপস্থিতিতেও গৌড়ীয় ও উৎকলীয় ভক্তগণ কিনা তাঁদের প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করতে পারেন নি!—এটী পাণ্ডাজীদের মতো তত্ত্বজ্ঞানহীন গবেষকদের ধারণাতেই সম্ভব। আত্মদর্শী সেই গৌর-ভক্তগণ দেহসর্ব্বস্ব গবেষকদের মতো চামড়ার বিচারপরায়ণ নন। সমগ্র বসুধাই যাঁদের কুটম্ব, নিজ-পর বলে যাঁদের কিছুই নেই, সেই আত্মধর্ম্মাবলম্বী গৌরভক্তগণকে প্রাদেশিকতার হীনমন্যতায় কলঙ্কিত করাবার প্রয়াস অহো কি-প্রকার দুরাগ্রহ! 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতির নিত্যপাঠকগণ পাণ্ডাজীদের এইপ্রকার আবিষ্কারে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। গবেষকজী অন্য এক স্থানে (তাঁর গ্রন্থে ১০৮ পৃষ্ঠায়) উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের মূল কারণরূপে চিহ্নিত করতে গিয়ে জানিয়েছেন—উৎকলীয় ভক্তগণ নাকি গৌড়ীয় ভক্তদের মতো বৃন্দাবনের দর্শনে (অর্থাৎ ব্রজের ভজন-প্রণালীতে) আস্থাবান ছিলেন না! বলিহারি যাই! উৎকলীয় গৌরভক্তগণ পাণ্ডাজীর এহেন তথ্য-পরিবেশনকে মেনে নিবেন কি? মহাপ্রভুর 'সাড়ে তিনজনের' যে অন্তরঙ্গতম গোষ্ঠী, যা শ্রীমতী রাধিকার গণরূপে কথিত হতো, সেই গোষ্ঠীতে এক শ্রীস্বরূপ-দামোদর ছাড়া আর বাকী তিন জন—শ্রীরায়-রামানন্দ, শিখি মাহিতি এবং তাঁর ভগিনী মাধবী দেবী সকলেই উৎকলবাসী ছিলেন।

✶ "**যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ। মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট-তর্ষণাদিকম্॥**" (ভাঃ ১০।৩।৬০)—ব্রহ্মা শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রবেশ ক'রে দর্শন করলেন—মানুষ, সিংহ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হলেও মিত্রতার সাথে সহাবস্থান করছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি-হেতু সেস্থান হতে ক্রোধ-লোভ-হিংসা সব পলায়ন করেছে। বস্তুতঃ এরূপ চিত্র বড় বড় মুনিগণের তপস্যাস্থলীতেও দেখা যায়, সেস্থলে মুনিগণেরও আরাধ্য শ্রীভগবানের লীলাস্থানে তা যে বিশেষভাবে দেখা যাবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?



"**প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।**
**জগতের মধ্যে 'পাত্র' সাড়ে তিন জন॥**
**স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।**
**শিখি মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন॥**"
(চৈঃ চঃ ৩।২।১০৫-১০৬)

এর পরেও কি বঙ্গীয় চরিতকারদের প্রাদেশিকতা-দোষ কিংবা উৎকলীয় ভক্তগণের 'বৃন্দাবনের দর্শনে' অনাস্থা প্রমাণিত হয়? এই সকল কি পাণ্ডাজীর অপপ্রচার নয়? "*ওড়িষ্যার যে-সব চৈতন্যভক্ত ব্রজের ভজন-প্রণালী গ্রহণ করেননি*" (পৃঃ-১৫) এবং "*উৎকলীয় ভক্তরা বৃন্দাবনের দর্শনে আস্থাবান নয়*" (পৃঃ-১০৮)—এইপ্রকার পরস্পর-বিরোধি-বার্ত্তা কি সুষ্ঠু গবেষণার লক্ষণ, না সুস্থ মানসিকতার?

(**অসঙ্গতি—৫**) শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীকানাই খুঁটিয়ার মধ্যে নাকি এক সময় মহামন্ত্রের রূপ নিয়ে বিবাদ উদয় হলে মহাপ্রভুর সভাপতিত্বে এক সভা আয়োজিত হয়। সেই সভায় নাকি উভয়প্রদেশের রীতিকেই অনুমতি প্রদান ক'রে গৌড়-দেশে 'হরে কৃষ্ণ' এবং উৎকল-দেশে 'হরে রাম' উচ্চারণমুখে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। হায় রে! এগুলি কি ইতিহাস, না ইতিহাস-বিকৃতি? মহাপ্রভু যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্যই যুগাবতার-রূপে আবির্ভূত—কোন প্রাদেশিক রীতি বা গোষ্ঠীর বিচারকে উৎসাহিত করার জন্য অবতীর্ণ হননি। নতুবা শ্রীমুকুন্দকে তিনি 'খড়জাঠিয়া' ঘোষণা ক'রে অদর্শন-দ্বারা দণ্ড প্রদান করতেন না। তিনি যুগোচিত শাস্ত্রীয় তারকব্রহ্ম-নাম যথাযথ আচরণ-দ্বারাই জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তজ্জন্য আজও উড়িষ্যায় গৌরভক্তগণের মধ্যে 'হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণ-মুখেই মহামন্ত্র কীর্ত্তনের প্রথা দৃষ্ট হয়, 'হরে রাম' দিয়ে নয়। সুতরাং মহামন্ত্র-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর গৃহীত সেই দ্বিবিধ ব্যবস্থার গল্প যে পাণ্ডাজীদেরই এক অপপ্রচার-বিশেষ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

(**অসঙ্গতি—৬**) শূদ্র (!) শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে নাকি মহাপ্রভু শালগ্রাম (!) পূজার ভার দেওয়ার সকল স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ এমনকি শ্রীবাসুদেব

সার্ব্বভৌম ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন এবং শ্রীকাশীমিশ্র মহাপ্রভুর প্রতি নাকি সাক্ষাৎ ক্রোধও প্রকাশ করেছিলেন। হায়! সত্যের কি-প্রকার অপলাপ। কথায় বলে—"**শূড়ীর সাক্ষী মাতাল।**" অর্থাৎ, যেমন শুঁড়ী, তেমনই মাতাল—যেমন সেই লীলামৃত-কার, তেমনই তার যোগ্য ব্যাখ্যাতা। মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে আদৌ শালগ্রাম দেননি—গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়েছিলেন। সেটী শ্রীদাস গোস্বামী স্বয়ংই তাঁর "শ্রীচৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষে" উল্লেখ করেছেন—

**"উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং,**
**দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"**

অর্থাৎ, 'যিনি আমাকে নিজের বক্ষের গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করেছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হয়ে আমাকে মত্ত করুন।' গোবর্দ্ধন-শিলার প্রতি স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণদের সাধারণতঃ শালগ্রাম-বুদ্ধি থাকে না। তাই তাঁরা এরূপও বলে থাকেন যে—'শ্রীরঘুনাথ দাস '**শূদ্র**' (?) ছিলেন বলেই নাকি মহাপ্রভুর নিকট হতে পূজার জন্য গোবর্দ্ধন-শিলাই পেয়েছিলেন, শালগ্রাম নয়।' সুতরাং যদি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ও কাশীমিশ্রকে 'বৈষ্ণব' না ভেবে সাধারণ স্মার্ত্ত-পণ্ডিতও ভাবা যায়, তাহলেও মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণই থাকে না—যেহেতু মহাপ্রভু শ্রীদাস গোস্বামীকে প্রকৃতপক্ষে গোবর্দ্ধন-শিলাই দিয়েছিলেন, শালগ্রাম নয়। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়—পাণ্ডাজী একের পর এক কিপ্রকার মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছেন এবং তাঁর আবিষ্কৃত উক্ত 'বৈষ্ণব-লীলামৃত' ওহ্ কিপ্রকারই না জাল-গ্রন্থ!

যদি মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শালগ্রাম দিতেনও, তথাপি পরমতত্ত্ববেত্তা শ্রীবাসুদেব ও শ্রীকাশীমিশ্র তাঁর শালগ্রাম-পূজাধিকার-বিষয়ে কখনই সংশয়ান্বিত হতেন না বা 'খোদার উপর খোদগিরি' করে মহাপ্রভুর প্রতি ক্ষুণ্ণও হতেন না। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভের জন্য ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা-সম স্ত্রীর শোক পরিবর্জ্জন করা ব্যক্তি যে কোনমতেই '**শূদ্র**'-পদবাচ্য নন এবং পদ্মপুরাণোক্ত "**ন তে শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ**"



এবং "**অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ**"-শ্লোকে '**বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিঃ.....বা নারকী সঃ**' অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র বা কোন প্রাকৃত বর্ণেরই যে অন্তর্গত নন, তাঁরা কেবল অপ্রাকৃত 'ভাগবত'-পদবাচ্য এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী ব্যক্তি যে কেবল নরকবাসেরই যোগ্যতা অর্জ্জন করে—এইসকল তত্ত্বজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের না থাকুক, কিন্তু মহাপ্রভু-চরণে সর্ব্বাত্ম-নিবেদিত এবং মহাপ্রভুর সান্নিধ্য-লাভ হেতু দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত শ্রীবাসুদেব এবং শ্রীকাশীমিশ্রের খুব ভাল মতোই ছিল। শ্রীপাণ্ডা এত মাথা খাটিয়ে শেষে যে মহা বৈষ্ণবাপরাধই মাত্র সঞ্চয় করলেন ও মহা অনর্থের পিত্ত মাত্র বৃদ্ধি করলেন, তা ভাবলে বেচারার জন্য কষ্টই বোধ হয়।

এইপ্রকার পদে পদে অতত্ত্ব ও অতথ্য অপপ্রচার করতে করতে শেষে যে লক্ষ্যাভিমুখে গবেষকজী অগ্রসর হচ্ছেন, তা পাঠকবর্গ হয়তো কিছু বুঝতে পারছেন। তিনি এসবের দ্বারা বঙ্গের ও উৎকলের ভক্তগণের মধ্যে এক সংঘাত-ময় পরিবেশ রচনা করতে চাইছেন, যার ভিত্তিতেই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে গল্পটী প্রকাশ করবার সংকল্প করেছেন। সেই অপলাপ পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গান্তর্গত 'নারকী রচনাবলী'র তালিকায় এই আধুনিকতম 'অনাসৃষ্টি'টাকে অন্তর্ভুক্ত না করলে প্রসঙ্গটী একপ্রকার অসম্পূর্ণই থেকে যেত। যা হোক্, জয়ানন্দ যখন সর্ব্বপ্রকারে অপ্রামাণিক প্রমাণিত হলেন, তখন কলির চরেরা খোদ্ 'বৈষ্ণববন্দনা'য় কথিত শ্রীমাধব পট্টনায়ক নামক এক (অপ্রসিদ্ধ) উৎকলবাসী গৌরভক্তের নামেই কিনা চৈতন্য-বিরোধিতায় নেমে পড়লেন! পরিকল্পনাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাঁদের এই অপকর্ম্ম কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দেবার মতোই একটী তুচ্ছ প্রয়াস মাত্র। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে পাঠকগণ এ-বিষয়ে আরও নিশ্চিত হবেন।

# চতুর্থ প্রসঙ্গ
# শ্রীচৈতন্য-বিষয়ে অপবাদ ও তার খণ্ডন

## প্রথম অপবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব বিষক্রিয়ায় মৃত্যুকবলিত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সম্পর্কে প্রথম অপবাদ এই যে, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে পুরীর রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনের সময় নৃত্যকালে একসময় পথের ইষ্টকখণ্ডে আঘাত-হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের চরণের ক্ষতস্থানে বিষক্রিয়া হওয়ায় তাঁর অকাল মৃত্যু হয়েছে। এটী যে কতপ্রকারে অযৌক্তিক হতে পারে, তদ্বিষয়ে সযুক্তি এক এক করে প্রদর্শিত হচ্ছে।

### অপ্রাকৃত ভগবৎ-অঙ্গে বিষক্রিয়া অসম্ভব

সর্ব্বপ্রথমেই বিশেষভাবে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ভগবানের শ্রীঅঙ্গ কখনও প্রকৃতি-জাত দ্রব্য-গঠিত নয়। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ অজ্ঞতায় কালাতিপাত করছেন, অথবা বলা যায়, অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। কেবল বই প'ড়ে ডাক্তারী করলে যেমন উৎপাত হয়, তেমনটীই কোন তত্ত্ববিদ্ গুরুর আশ্রয় ছাড়াই নিজে নিজে গ্রন্থ প'ড়ে সর্ব্বজ্ঞ-অভিমানীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবশ্য সাম্প্রতিক কালের ভুঁইফোঁড় অবতারগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হতেই পারে যে, অবতারগণও সাধারণ মানুষের মতোই রক্ত-মাংসের তৈরী। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি সকল শাস্ত্রই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই যে, তিনি এই জড়া প্রকৃতির মধ্যে আগমন করলেও তিনি কখনও সেই প্রকৃতির ধর্ম্মে আবদ্ধ হন না—সর্ব্বদা আত্মস্বরূপেই তিনি অবস্থিত থাকেন।[১] নতুবা কর্ম্মফল-বাধ্য জীব ও কর্ম্মফল-প্রদাতা ঈশ্বরের মধ্যে কি-ই বা আর পার্থক্য থাক্‌লো? আর বরাহপুরাণে ত' এটী অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া আছে,—

১। "এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" (ভাঃ ১।১১।৩৮)। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ ১।৭।১১৫)



**"ন তস্য প্রাকৃত-মূর্ত্তির্মাংস-মেদোঽস্থিসম্ভবঃ।**
**ন যোগীত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ॥"**

অর্থাৎ, ভগবানের কোন মাংস-মেদ-অস্থি-জাত প্রাকৃত-মূর্ত্তি নেই। যোগিত্ব-হেতু অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্য-লাভের প্রভাবেই যে তাঁর এইপ্রকার অপ্রাকৃতত্ব, তা নয়,—স্বয়ং ঈশ্বর বলেই তিনি নিত্যই প্রকৃতির ঊর্দ্ধে—যেহেতু তিনি সত্যরূপ, অচ্যুত এবং বিভু। এ সম্বন্ধে বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে,—যে ব্যক্তি ভগবৎমূর্ত্তিকে 'ভৌতিক' (অর্থাৎ রক্ত-মাংসের গঠিত) বলে বিচার করে, তাকে সমস্ত শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধান হতে বহিষ্কার করা কর্ত্তব্য, এমনকি তার মুখ দর্শন করা মাত্র সবস্ত্রে স্নান করণীয়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নিত্য অপ্রাকৃতত্বের পরিচয় সম্বন্ধে এখন যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্,—

"ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর। ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর॥
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল। হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প। মহা শীতে বাজে হেন বালকের দন্ত॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখন বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ॥
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি। ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি। তিলার্দ্ধেক নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমতে হয়। অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময়॥
কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ-দুই-তিন। কখনো স্বভাব হইতে অতিশয় ক্ষীণ॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস-ব্রণসম রোমবৃন্দ পুলকিত। শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়। লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম্। 'জজ গগ' 'জজ গগ'—গদ্‌গদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল। আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল॥

দেহকান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ। কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায়। শুষ্ককাষ্ঠ-সম পদ-হস্ত না চলয়॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন। যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এ-সব বর্ণনাকে পাষণ্ড-চিত্ত ব্যক্তির লোকেরা অতিরঞ্জিত বলেই মনে করে—অবিশ্বাসী জন্মান্ধদের কাছে যেমন সকলই অতিরঞ্জিত। কিন্তু পুরীতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-বৃক্ষে যখন এইপ্রকার 'সূদ্দীপ্ত'✶ সাত্ত্বিক ভাব-পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হতে লাগল, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তা দর্শন ক'রে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন। বস্তুতঃ এইপ্রকার দর্শন তাঁর জীবনে তখন সেই প্রথম। মহাপ্রভুর ভগবত্তা তাঁর নিকট তখনও বিদিত হয়নি। কিন্তু শাস্ত্রবিষয়ে পারঙ্গত হওয়ায় তিনি সেই ভাবের পরম অলৌকিকত্ব অনুভব করলেন। এবং ভাবতে লাগলেন—

**"সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।**
**নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত-ভাব' হয়॥**
**অধিরূঢ় ভাব যাঁর, তাঁর এ বিকার।**
**মনুষ্যের দেহে দেখি—বড় চমৎকার॥"**

(চৈঃ চঃ ২।৬।১২-১৩)

✶ **'সূদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক ভাব**—সত্ত্বের তারতম্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবসকল উত্তরোত্তর 'ধূমায়িত', 'জ্বলিত', 'দীপ্ত' ও 'উদ্দীপ্ত'-এই চারপ্রকারে প্রকাশিত হয়। অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের ১ অথবা ২টী শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হলে যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, সেই 'ভাব' 'ধূমায়িত'; এককালে ২ অথবা ৩টী সাত্ত্বিকভাব প্রকাশমান হলে যেস্থেলে কষ্টে তার সঙ্গোপন সম্ভব হয়, তা 'জ্বলিত'; ৩, ৪ বা ৫টী প্রৌঢ়ভাবের এককালীন উদয়ে তাদের সম্বরণ করবার চেষ্টা বিফল হলে, সেই ভাব 'দীপ্ত'; এককালে ৫, ৬ অথবা সকল ভাবই প্রকাশিত হয়ে প্রেমের পরমোৎকর্ষতায় আরোহণ করলে সেই ভাব 'উদ্দীপ্ত' নামে কথিত হয়। সমস্ত অষ্টসাত্ত্বিক ভাবই যখন কোটিগুণিত হয়ে ভাবের সীমারূপে প্রকাশ পায়, তখন তা' 'সূদ্দীপ্ত' সংজ্ঞা লাভ করে। এই ভাব সু-দুর্ল্লভ, ত্রিলোকে কোথাও তার প্রকাশ নেই। বস্তুতঃ 'উদ্দীপ্ত' ভাবই জগতে অতি কদাচিৎ প্রকাশমান হয়, সেস্থলে 'সূদীপ্ত' ভাবের কোন প্রসঙ্গই এই ব্রহ্মাণ্ডে নেই।



শ্রীসার্ব্বভৌম মনে মনে বিচার আরম্ভ করলেন,—এই 'সূদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক-ভাব তো ভগবৎপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। কেবলমাত্র ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-গণেই তার প্রকাশ হয়ে থাকে। এই মর্ত্ত্যলোকের কি কথা, ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দভুবনের কোন প্রাণীতেই ত' এই 'ভাব' সম্ভব নয়। আবার ভগবানের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদগণের মধ্যেও যাঁর "অধিরূঢ় মহাভাব", কেবল তাঁরই অঙ্গে মাত্র এই 'সূদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই ভাব ত' অসাধারণের মধ্যেও পরম অসাধারণ। কিন্তু আশ্চর্য্য, কিভাবে তা এক মর্ত্ত্য মানবের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে!—এই ভেবে ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত চমৎকৃত হতে লাগলেন। ভট্টাচার্য্যের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাই সেই ভাবের প্রতি অলৌকিক বুদ্ধি হয়েছিল এবং সেজন্য তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতও হয়েছিলেন; কিন্তু মায়ামোহিত হওয়ায় সেই ভাবের আধার স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর সে-লোকাতীতত্বের বুদ্ধি জাগ্রত হয়নি। তাই স্কন্দপুরাণে মায়ামুগ্ধ জীবে এই প্রকার ভ্রান্তির প্রতি এক খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে—

**"আনন্দরূপং দৃষ্ট্বাপি লোকো ভৌতিকমেব তু।**
**মন্যতে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভ্রান্তির্বলীয়সী॥"**

ভগবানের এইপ্রকার দিব্য আনন্দরূপ দর্শন-শ্রবণ করেও লোকে সেই বিষ্ণুরূপকে কিনা ভৌতিক বলে মনে করে!—অহো, তাদের এটী কি-প্রকার ভ্রান্তি!! '*ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে*'—ফলের দ্বারাই যখন ফলের কারণ অনুমিত হবার বিধান, তখন মহাপ্রভুর সেই ভাবসকল পরম অলৌকিক হওয়ায়, সেই ভাবসকলের যে-অধিষ্ঠান, সেই মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ ত' অতএব অপ্রাকৃতই প্রমাণিত হয়। কারণ, ভৌতিক দেহে জড়-সত্ত্বে সেই সকলের প্রকাশ কখনও সম্ভব নয়—কেবল বিশুদ্ধসত্ত্বেই সে অপ্রাকৃত ভাবসকল প্রকাশমান হয়। যাই হোক্, মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের অবশেষে সকল মর্ত্ত্য-বুদ্ধির অবসান ঘটলো; মহাপ্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, তা সাক্ষাৎ দর্শন ক'রে তিনি কৃতকৃতার্থ হলেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুর্ম্মতির জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলেন ও নানাপ্রকার বন্দনায় তিনি মুখর হয়ে উঠলেন।—

**''বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।**
**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্য্যস্তমহং প্রপদ্যে॥''** [২]

(চৈঃ ভাঃ ৩।৩।১২৬)

সুতরাং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ কখনও পাঞ্চভৌতিক কিছু নয়। পঞ্চভূতের শরীরেই মাত্র কোন ক্ষতজনিত বিষক্রিয়া, পচনরোগ প্রভৃতি হয়ে থাকে। যেস্থানে এই জড়া প্রকৃতির কোন গন্ধমাত্রই নেই, সেস্থানে এইসকল প্রাকৃতিক বিকার কি-প্রকারে সম্ভব?

**''পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত''**

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভূতপূর্ব্ব নৃত্যের ধারণা পাষণ্ড-চিত্তের ভৌতিক ভাবনায় কখনই সম্ভব নয়। সাধারণ মর্ত্ত্যজীবের কি কথা, নটরাজ শম্ভুর শ্রীকৃষ্ণনামাবেশে যে উদ্দণ্ড নৃত্য, তা'ও মহাপ্রভুর সেই সর্ব্বমনোহর ও যুগপৎ ভয়ঙ্কর নৃত্যের সাথে তুলনীয় নয়।—

**''শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।**
**বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী উপরে॥**
**হেন সে আছাড়, প্রভু পড়ে নিরন্তর।**
**পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সবে পায় ডর॥''**(চৈঃ ভাঃ ২।৮।১২৩-১২৪)

আর শচীমাতা ত' তাঁ'র নিমাইয়ের নৃত্যে আনন্দিত হওয়া অপেক্ষা অধিক সন্ত্রস্তই থাকতেন,—

**''সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।**
**'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই মুদি দুই আঁখি॥''** (চৈঃ ভাঃ২।৮।১২৫)

পুনরায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন-উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে রামকেলি-গ্রামে যখন সপরিকর উপস্থিত হলেন, তখন তিনি উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করলেন। ওদিকে হুসেন শাহ বাদশাহের কোতোয়াল খবরাখবর সংগ্রহ করতে এসে

২। ''বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে। যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু—পুরুষপুরাণ। ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান॥ হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ-গুণ-নাম। স্ফূরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥—চৈঃ ভাঃ ৩।৩।১২৭-১২৯



মহাপ্রভুর সেই অভূতপূর্ব্ব নৃত্য দর্শন ক'রে বিস্ফারিত-নেত্র হয়ে গেলেন। বাদশাহের নিকট গিয়ে কোতোয়াল সেই নৃত্যের বর্ণনা দিলেন,—

''নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত গুণ আছাড়ের রঙ্গ॥
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত।
**পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥**'' (চৈঃ ভাঃ৩।৪।৩৫-৩৬)

এখন দেখুন—যেস্থলে মহাপ্রভুর নৃত্যকালে ''পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত'', সেস্থলে সেই নৃত্যকালেই সামান্য এক ইষ্টকখণ্ডে আহত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণের গল্প কি নিতান্তই হাস্যকর নয়?

**মহাপ্রভুর অঙ্গস্পর্শেই কুষ্ঠাদির নাশ, সেস্থলে বিষক্রিয়া!**

স্পর্শমণির স্পর্শমাত্রেই যেস্থলে লৌহ প্রভৃতি ধাতু স্বর্ণে পরিণত হয়, সেস্থলে স্পর্শমণি, চিন্তামণি, কল্পতরু প্রভৃতিরও যিনি কারণ, সেই ভগবৎ-স্পর্শে জীবের যে কি অবস্থা হয়, তা শুষ্কযুক্তি-নিষ্ঠ লোক কল্পনাও করতে পারে না। 'বাসুদেব'-নামক এক বিপ্র, যাঁর ''**সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময়**''—তিনি মহাপ্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শেই কুষ্ঠ হতে মুক্ত হলেন—ভগবৎ-প্রেমানন্দসহ তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ সৌন্দর্য্যে শোভিত হল—

**''প্রভু স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।**
**আনন্দ সহিতে অঙ্গ হইল সুন্দর॥''** (চৈঃ চঃ ২।৭।১৪৪)

শ্রীসনাতন গোস্বামী একসময় বৃন্দাবন হতে পুরী-অভিমুখে ঝারিখণ্ড বনভূমি দিয়ে গমনকালে স্থানীয় জলের দোষে তিনি খোস-পাঁচড়া-রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর সমগ্র শরীর থেকে রস ভীষণভাবে ক্ষরণ হতে লাগল। পুরীতে মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ হলে মহাপ্রভু তাঁকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন—ফলে, তাঁর সেই ব্যাধি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয়ে স্বর্ণবর্ণ কান্তিতে তিনি দীপ্ত হতে লাগলেন,—

**''এত বলি পুনঃ তারে কৈলা আলিঙ্গন।**
**কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥''** (চৈঃ চঃ ৩।৪।২০১)

পুনরায়, সার্ব্বভৌম জামাতা অমোঘ শ্রীচৈতন্য-নিন্দাবশে বিসূচিকা (কলেরা)-রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব তার বক্ষে শ্রীহস্ত স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে রোগমুক্ত হয়ে কৃষ্ণনামানন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে লাগল—

**''উঠহ অমোঘ তুমি লও কৃষ্ণনাম।**
**অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্॥**
**শুনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা।**
**প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা॥''**

(চৈঃ চঃ ২।১৫।২৭৭-২৭৮)

এইপ্রকারে অসংখ্য দৃষ্টান্ত তাঁর চরিতামৃত আলোচনাকালে দেখা যায়। বস্তুতঃ ভবরোগ যাঁর দর্শনমাত্রে পলায়ন করে, সেস্থলে শারীরিক রোগের কথাই বা কি? ''সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ' সেই শ্রীমন্মহাপ্রভু, যাঁর স্পর্শমাত্রে জীব কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-সহ ভবরোগ থেকেই মুক্ত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে যায়—সেই তিনি কিনা স্বয়ংই এক ইষ্টকখণ্ডের ক্ষতে (?) বিষক্রিয়ার ফলে প্রাণত্যাগ করলেন! এরূপ 'আষাঢ়ে-গল্প' নাস্তিকতার নেশা হতেই যে উদ্ভূত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি?

## মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-সম্বন্ধে আধুনিকতম গল্প

এখন শ্রীচৈতন্য-বিরোধিতার আধুনিকতম রূপকার (এই গ্রন্থে ৪৫-৫৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) পাণ্ডাজী শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে যে গল্প ফেঁদেছেন, তা তুলে ধরা হচ্ছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু নাকি রুক্মিণী-অমাবস্যাতে ইটের আঘাতে বামপায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অক্ষয়-তৃতীয়াতে জগন্নাথ-মন্দিরে (উত্তর পাশের মণ্ডপে) প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং এতে জয়ানন্দের দ্বারা মহাপ্রভুর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়ে গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রাণত্যাগের বর্ণনা যে একটা আষাঢ়ে গল্পবিশেষ, তা পক্ষান্তরে যেমন প্রমাণিত হল, সাথে সাথে আবার তাঁর গুমখুন হওয়ার কাহিনীও যে একটী ধাপ্পা, তাও জানা গেল। পাণ্ডাজী নিজেও সেই গুমখুনের ঘটনাকে রঞ্জনবাবুর সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত



ব্যাপার বলে প্রকাশ করেছেন। এখন তাঁর নিজের গবেষণাজাত গল্পটী এইপ্রকার—শ্রীরামানন্দ শোকাহত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রাজা প্রতাপরুদ্রকে বুদ্ধি দিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের মরদেহ (!) জগন্নাথ-মন্দির এলাকা থেকে না বের করে বরং মন্দিরস্থ 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' গৌড়ীয় ভক্তগণের অলক্ষ্যে সমাধিস্থ করা হোক্। পরে গৌড়ীয় ভক্তদের কাছে 'মহাপ্রভু জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হয়েছেন'—এইটী প্রচার করে দিলেই হল। নতুবা উৎকলবাসী ভক্তদের উপর পূর্ব্ব হতে ক্ষিপ্ত গৌড়ীয়রা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা সংশয়, বিবাদ প্রভৃতি করতে পারে, এমনকি তাঁদের মুসলমান রাজাকে দিয়ে উৎকলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। শোকাচ্ছন্ন রাজা যুদ্ধবিগ্রহের ভয়ে নাকি তখন শ্রীরামানন্দের প্রস্তাবটীকে মেনে নিলেন।

বাহ্ কি চমৎকার গল্প! এই না হলে 'গল্পের গরু গাছে উঠে'! এই না হলে 'বৈষ্ণব-লীলা-মৃত'! অর্থাৎ এইভাবে না হলে কি বৈষ্ণব-চৈতন্যের লীলা মৃত করা যায়? পাণ্ডাজীদের গল্পে মহাপ্রভুর ইষ্টকাঘাত থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত সময়ে গ্রন্থকারের কোন্ যাদুবলে সমগ্র পুরীধাম একেবারে গৌড়দেশীয় ভক্তশূন্য হয়ে গেল, যে পরে তাঁদেরকে একটা কিছু প্রবোধ দিয়ে দিলেই হল? শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য সহচর শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, সেবক শ্রীগোবিন্দ, 'প্রভুপাদোপাধান' অর্থাৎ প্রভুর চরণ-বালিশ নামে সুপরিচিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত, অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁরা সে-সময় কোথায় ছিলেন? এইরূপে পাণ্ডাজীর সৃষ্ট গল্প-মধ্যে একাধিক অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয়। সেগুলি এক এক করে ক্রমে নীচে প্রদর্শিত হচ্ছে।—

### অস্বাভাবিকতা—১

'লীলা-মৃত'কার তথা পাণ্ডাজী পাঠকগণকে কোনরকমে প্রবোধ দেওয়ার মতোই একটা অপপ্রয়াস চালিয়েছেন—''*প্রথমতঃ শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হতে পারতেন না দুজন—রঘুনাথ-দাস আর স্বরূপ-দামোদর। রঘুনাথের উপর ন্যস্ত হয়েছিল শালগ্রাম-পূজার ভার আর স্বরূপ-*

*দামোদের প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন।*" (*শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব্ব, পৃঃ-১০২)*। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নাকি শ্রীরূপের পুরী হতে বৃন্দাবন-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সহযাত্রী হয়েছিলেন, তাই মহাপ্রভুর তিরোধানকালে তাঁর উপস্থিতি ছিল না। এবং তৃতীয়তঃ স্বরূপ দামোদর নাকি মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই কোন মাঘী শুক্লা একাদশীতে প্রাণত্যাগ করেন। তখন "*শ্রীচৈতন্যের আদেশে সকলে স্বরূপের মরদেহ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন এবং তারপর তাঁরই আদেশে টোটা গোপীনাথের পূজক গদাধর পণ্ডিত গৌড়ে গিয়ে স্বরূপের দেহান্ত হওয়ার সংবাদ দিলেন। এরপর গদাধর পণ্ডিত নীলাচলে ফিরে এসেছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই।*" *(পৃঃ-৬১-৬২)*। অবশিষ্ট শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি সম্বন্ধে পাণ্ডাজীর গবেষণায় কোনপ্রকার উল্লেখ নেই—যেন সেই নামের কেউ ছিলেনই না।

**অস্বাভাবিকতা—২**

একটা মিথ্যা কথা খাড়া করতে আরও যে কত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তা পাণ্ডাজীর এই গল্পই প্রমাণ। প্রথমতঃ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নাকি এতই শালগ্রাম পূজায় ব্যস্ত থাকতেন যে, মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকবার অবসরই হত না। শ্রীদাস গোস্বামী যে মহাপ্রভুর নিকট থেকে শালগ্রাম নয়, গোবর্দ্ধন-শিলাই পেয়েছিলেন—তা পূর্ব্বে (এই গ্রন্থে ৫২ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে। এক কুঁজা জল আর অষ্ট তুলসী-মঞ্জরীদ্বারা গোবর্দ্ধন-শিলার যে-পূজার বিধান স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন, সেই পূজায় তাঁর সারাদিনই অতিবাহিত হয়ে যেত—এ কথা কোন মূর্খেও বিশ্বাস করবে না। আর তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর সাথে আদৌ বৃন্দাবন যাত্রা করেননি। মহাপ্রভু এবং তৎপশ্চাৎ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোধানের পরই তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও তা সমর্থিত হয়—"**প্রভুর বিয়োগ, স্বরূপের অদর্শন। মহা দুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন॥**" মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-সমূহের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বিশেষ করে শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরঘুনাথ দাসই ছিলেন।



"স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ (অন্ত্য) লীলা প্রকাশ॥
**সেকালে এই দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।**
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে॥" (চৈঃ চঃ অঃ ১৪।৭-৮)

আর এই দুইজনকেই 'লীলা-মৃত'কার তথা পাণ্ডাজী মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-সময়ে পুরীছাড়া করলেন। তা না হলে তাঁদের কার্য্যসিদ্ধি হবে কি করে?

**অস্বাভাবিকতা—৩**

শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভু যদি সত্যই মহাপ্রভুর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করতেন, তবে তিনি, যিনি নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর অপেক্ষাও মহাপ্রভুর কোটীগুণ অধিক প্রিয় ছিলেন, মহাপ্রভুর 'দ্বিতীয় স্বরূপ' বলে যাঁর খ্যাতি, সেই তাঁর 'মরদেহ' (!) মহাপ্রভু কখনই অন্যান্যের দ্বারা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতেন না—বরং স্বয়ং নিজেই ক্রোড়ে ধারণ ক'রে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি-প্রদান অপেক্ষাও তিনি অধিক আড়ম্বরেই তাঁর প্রাণের শ্রীস্বরূপকে সমাধি দিতেন এবং সেই সমাধি গৌরভক্তগণের কাছে এক বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থানে পরিণত হতো এবং শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ চরিতকারগণ পঞ্চমুখে মহাপ্রভুর সেই লীলা বর্ণনা করতেন।

**অস্বাভাবিকতা—৪**

আবার কল্পনার উপর কেমন কল্পনা দেখুন! যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত ক্ষেত্র-সন্ন্যাসী বলে মহাপ্রভু তাঁর সহস্র মিনতি-সত্ত্বেও তাঁকে বৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গী করেন নি, বরং পুনঃ পুনঃ 'ক্ষেত্রে'ই অবস্থানের আদেশ প্রদান করেছিলেন, সেই শ্রীগদাধরকেই কিনা মহাপ্রভু গৌড়ে শ্রীস্বরূপের দেহান্তের সংবাদ দিতে পাঠালেন! পুরীধামে সেই সংবাদ-বাহক হিসাবে তাঁর বিকল্প কি আর কেউ ছিলেন না, যে তাঁকেই এমন কি তাঁর ক্ষেত্র-সন্ন্যাস বর্জ্জন করিয়েও গৌড়ে পাঠাতে হয়েছিল? আবার দেখুন, মহাপ্রভু বৃন্দাবন-পথে যাত্রা করলে যে শ্রীগদাধর তাঁর বিরহে এমনকি তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও '**ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক্ রসাতল**' (চৈঃ চঃ ২।১৬।১৩১) বলে পুরীধাম

থেকে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কটক পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিলেন, সেই শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে ছেড়ে কেবল শ্রীস্বরূপের দেহান্তর সংবাদ দিতেই কিনা গৌড়দেশে যাত্রা করলেন এবং তিনি পরে আর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন, কি করলেন না, তা সেই তার শিষ্য (!) ও সাল-তারিখসহ এত নিখুঁত (!) লীলাবর্ণনকারী 'লীলামৃত'-কারও কিনা জানেন না বা তাঁর গল্পে উল্লেখ করা প্রয়োজনও বোধ করলেন না? তাই বলি, 'গল্পের গরু কেমন গাছে উঠে!' পাণ্ডাজীরাই একমাত্র বুদ্ধিমান্—তাঁদের প্রলাপগুলির যাচাই করার বুদ্ধি পৃথিবীতে আর কারও নেই।

**অস্বাভাবিকতা—৫**

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ও নীলাচল উভয়-লীলাতেই যিনি নিত্য সহচর ছিলেন, সেই শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সম্বন্ধে পাণ্ডাজী কোন কথাই খরচ করেননি। শ্রীজগদানন্দের মাধ্যমেই শান্তিপুর হতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর জন্য যে সুবিখ্যাত ও রহস্যময় 'তর্জ্জা'✶ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯।২০-২১) পাঠিয়েছিলেন, যাতে মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়েছিল, সেই তর্জ্জার কোনও খবর, না 'লীলামৃত'-কার, না তার গবেষক, কেউই জানেন না! শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁর 'শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্'-এর ৪র্থ শ্লোকে **"যস্যৈবাজ্ঞা-মাত্রতোঽন্তর্দ্দধেঽপি"** (অর্থাৎ যাঁর আজ্ঞামাত্রে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র অন্তর্দ্ধান করেছিলেন) বর্ণনার দ্বারা মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের যে-সূত্র রেখে গেছেন, তাও কি গবেষকজীর জানা নেই? আসলে এহেন চরিত্র এবং প্রসঙ্গকে উত্থাপন করলে তাঁদের ইষ্টকাঘাতে প্রাণত্যাগ করানোর গল্প যে ধোপে টেকে না।

**অস্বাভাবিকতা—৬**

আর নবদ্বীপের অন্তর্গত 'বিদ্যানগর' পল্লীর অধিবাসী শ্রীমহেশ্বর বিশারদের পুত্র শ্রীসার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্যকে মহারাজ প্রতাপরুদ্র কি ভাবতেন—গৌড়ীয়, না উৎকলীয়? আর তিনি মহাপ্রভুর সেই অন্তিম-কালে

✶ "বাউলকে কহিও—লোক হইল বাউল। বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল॥ বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"



কোথায় ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধেও পাণ্ডাজী কেন নিশ্চুপ? তাঁকেও কি মহারাজ মহাপ্রভুর জগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়ার গল্প শুনিয়েছিলেন? আর মহাপ্রভুর 'পাদোপাধান'-নামে খ্যাত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত কিংবা তাঁর নিজ সেবক ও গুরুভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ এবং বলবান্ শ্রীকাশীশ্বরকে পাণ্ডাজীরা কোন্ অজুহাতে পুরীধাম থেকে উধাও করবেন? তাঁদের সম্বন্ধে 'লীলা-মৃত'কারের কি কিছুই জানা নেই? নাকি সেই সব নামে কোন চরিত্রই ছিলেন না? একজন আসামী যতই গপ্প তৈরী করুক্, কিন্তু যখন তদন্ত করা হয়, তখন তার সব গপ্পই ধরা প'ড়ে যায়। সুতরাং এইভাবে একের পর এক মিথ্যা বিবৃতিতে পাণ্ডাজীদের দুরভিসন্ধি বুঝে নিতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হয় না।

**অস্বাভাবিকতা—৭**

পাঠকগণ! পাণ্ডাজীদের কল্পনার ডানায় চড়ে ভাবুন দেখি—মহাপ্রভু ইষ্টকাঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন,—অথচ তাঁর সেই ভীষণ অসুস্থতার খবর চারিদিকে চাউর না হয়ে কেবলমাত্র কিছু উৎকলীয় ভক্তগণই তা জানতে পারলেন—কোন এক 'অতিবাড়ী' জগন্নাথ-দাসের নিকট থেকে সেবা লাভ ছাড়া মহাপ্রভুর ভাগ্যে তখন আর কোন সেবকই নেই—অপরদিকে ছায়ার মত লেগে থাকা মহাপ্রভুর গৌড়দেশীয় সমস্ত সেবকগণ কোন এক রূপার যাদুকাঠির স্পর্শে সব নিদ্রাকোলে ঢলে পড়লেন—আর এদিকে মহাপ্রভু সকলের অলক্ষ্যে কেবল সেই 'অতিবাড়ী'র সাক্ষাতেই প্রাণত্যাগ করলেন—সারারাত সেইভাবে অতিবাহিত হয়ে ভোর হলে পর পরম নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপনকারী সেই উৎকলীয় ভক্তরা সে-সংবাদ জানতে পেরে তখন শোকাহত হলেন—শোকে মুহ্যমান্ সেই তাঁদের যুক্তি-পরামর্শে 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' মহাপ্রভুর সমাধিও হয়ে গেল—এইভাবে সবকিছু শেষ হলে পর সোনার যাদুকাঠির স্পর্শে গৌড়দেশীয় সেবকগণ জেগে উঠে কিনা মহাপ্রভুর জগন্নাথে লীন হওয়ার গপ্প শুনলেন। আর এইজন্যই নাকি গৌড়দেশের ভক্তগণ মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের আসল ঘটনা কিস্‌সু জানেন না—যত জানেন সেই 'লীলা-মৃত'কার! সেক্ষেত্রে আমাদেরও

এই জ্ঞাতব্য যে, সেই যাদুকাঠিগুলির সর্ব্বসত্ব-সংরক্ষক হচ্ছেন কেবলমাত্র সেই '**মাধব পামর**', যা কিনা বর্ত্তমানে পাণ্ডাজীর নিকটই গচ্ছিত আছে।

**অস্বাভাবিকতা—৮**

'পথে নর্ত্তনকালে ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে মহাপ্রভু জ্ঞানহারা হয়ে পড়লে সেই প্রচুর রক্তক্ষরণ অবস্থাতে তাঁর কেবল উৎকলীয় সঙ্গীগণই (যেহেতু গৌড়দেশীয় সঙ্গীগণ তখন সকলে যাদুকাঠির দৌলতে গভীর নিদ্রাকাতর ছিলেন) তাঁকে 'কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথ-মন্দিরটীর উত্তর-পাশের মণ্ডপে চিৎ-করে শুইয়ে দিলেন।' কিন্তু জ্ঞানহারা মহাপ্রভুকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় রাস্তা থেকে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া কি 'ধান ভাঙতে শিবের গীত' গাওয়া নয়? সঙ্গীগণ কোথায় তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাবেন, নিদেনপক্ষে দুর্ঘটনা-স্থলের নিকটস্থ কোন ভক্তগৃহেই দ্রুত নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন—যেটি দুর্ঘটনাত্তোর-কালে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, তা না ক'রে মহাপ্রভুকে 'বাইচ-পাহাচে'র সিঁড়ি-সহ এতটা রাস্তা ভেঙ্গে জগন্নাথ-মন্দিরের মণ্ডপে কিনা নিয়ে গেলেন! এমন নয় যে, মহাপ্রভু সঙ্গীদেরকে জগন্নাথ-মন্দিরেই নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন—কারণ, তিনি তো তখন 'ইষ্টকাঘাতে জ্ঞানহারা' ছিলেন বলেই গবেষকজী জানিয়েছেন। তাহলে কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য তাঁকে জগন্নাথ-মন্দিরে নিয়ে যাওয়া? তারপর সেই থেকে অক্ষয়-তৃতীয়া পর্য্যন্ত মহাপ্রভু সেই মণ্ডপেই কিনা পড়েছিলেন—উৎকলীয় সেই ভক্তরা মহাপ্রভুর প্রতি প্রবল প্রেমাতিশয্যেও কিনা তাঁকে সেই দুর্ঘটনাস্থল থেকে নিজগৃহে নেওয়ার কিংবা সেই মণ্ডপ থেকে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না! মহাপ্রভু নীলাচলে প্রথম জগন্নাথ-দর্শনকালে ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে যে-স্থলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই সন্ন্যাসীকে জগন্নাথ-মন্দির থেকে পরমাদরে নিজগৃহে আনয়ন ক'রে পরিচর্য্যা করেছিলেন, সেস্থলে দীর্ঘ ২৪ বৎসরের পরিচয়েও সেই প্রাণাধিকের এইপ্রকার রক্তক্ষরণ, প্রবল জ্বর অবস্থাতেও



শ্রীভট্টাচার্য্য কিংবা অন্যান্য উৎকলীয় ভক্তগণ তাঁকে কিনা সেই মণ্ডপে শুইয়ে রেখে দিলেন! কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? খুব সম্ভব, তা না হলে সে স্থান হতে অনতিদূরেই 'কোইলী বৈকুণ্ঠে' সমাধি দেওয়ার গল্পটা দাঁড়াবে কি ক'রে? যদি বল, কিন্তু সেখানে ত' একমাত্র কেবল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, সুভদ্রাদেবীর পরিত্যক্ত বিগ্রহেরই সমাধি দেওয়ার বিধান; কখনও সেখানে কোন মানবেরই (তিনি যতই উচ্চাধিকারী, এমনকি 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমান' হন না কেন) সমাধি দেওয়ার কোন বিধিই নেই কিংবা দৃষ্টান্তও নেই। তাহলে বলি শুন—'পূর্ব্বে তাঁর অবতারত্ব স্বীকৃত না হলেও এই মুহূর্ত্তে তিনি আর কোন মানব নন, একেবারে ভগবান্, তাই না সেখানে সমাধি দিচ্ছি—ভগবান্ সব এক জায়গাতেই থাকুক—হেঁ হেঁ হেঁ, বুঝলে কিনা।'

**অস্বাভাবিকতা—৯**

পাণ্ডাজী মহাপ্রভুর প্রাণত্যাগের গল্পারম্ভে জানালেন,—"*শ্রীচৈতন্য ছিলেন পুণ্যদেহের অধিকারী। কিন্তু এইসময় থেকে ধীরে ধীরে তাঁর শরীরও ক্ষয় পেতে থাকে।*" *(পৃঃ ৬২)*। তাই নাকি? পঞ্চাশ বৎসরও যাঁর বয়স অতিক্রম হয়নি, আজ থেকে পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব্বের সেই অত্যন্ত সুঠাম-দেহধারী, সর্ব্বমহাপুরুষ-লক্ষণে শোভিত সেই ব্যক্তির শরীর হঠাৎ কোন্ কারণে ক্ষয় পেতে আরম্ভ করল? 'লীলা-মৃত' গবেষণাকালে কোন রোগ-টোগের কথা কি পাণ্ডাজীর চোখে পড়েনি? পঞ্চাশবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই অকারণে বা সকারণে ক্ষয় হতে থাকা ব্যক্তিকে তাহলে কোন্ লক্ষণে তিনি '*পুণ্যদেহের অধিকারী*' নির্ণয় করলেন? 'সোনার পাথরবাটী' বাস্তবে অসম্ভব হলেও পাণ্ডাজীর গবেষণা-মধ্যে যেন এক বিশেষ স্থান লাভ ক'রে ধন্য হয়েছে। পায়ে ইষ্টকাঘাতে (সে যত বড় আঘাতই হোক) রুক্মিণী-অমাবস্যা থেকে অক্ষয়-তৃতীয়া পর্য্যন্ত (পাণ্ডাজীর হিসাবমতে) মাত্র এই তিনদিনেই সেই '*পুণ্যদেহের অধিকারী*'র প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা যে পূর্ব্ব থেকেই অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীরের গল্প আরম্ভ না করলে থাকে না। পাণ্ডাজী তাঁর পাঠকগণকে কি এত শিশুমস্তিষ্ক ভাবেন?

**অস্বাভাবিকতা—১০**

শ্রীপাণ্ডা তাঁর গ্রন্থে এক জায়গায় জানালেন (নাকি জানাতে বাধ্য হলেন)—"*'অলৌকিক' আর 'অসত্য'—এই দুটী শব্দকে আমরা সমার্থক কখনই মনে করি না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমন বহু ঘটনা আজও ঘটে, কোন তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও যার ব্যাখ্যা মিলে না।*" *(পৃঃ ৮৮)*। তাই নাকি? কিন্তু পাণ্ডাজীর মুখের কথা আর বুকের কথা মধ্যে যে কতটা ফারাক্ আছে, তা এখনই স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা দেখি —বানর যদি কোনপ্রকারে মুক্তামালা সংগ্রহ ক'রে অনুকরণ-স্বভাববশে গলদেশে ধারণ করেও, তথাপি সে মুহূর্ত্তেই তার দন্তাঘাতে তা খণ্ড-বিখণ্ড ক'রে ফেলে। এস্থলেও দেখা গেল—গবেষকজী 'অলৌকিকতা'-সম্বন্ধে এত মূল্যবান্ বক্তব্য তুলে ধরলেও শেষে কিন্তু তা আর বজায় রাখতে পারেননি—নিজেই তা ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে অলৌকিক-বিষয়ে নিজের অযোগ্যতাই প্রমাণ করলেন—"*রাধাগোবিন্দ-নাথ শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্পাদনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট-ভাবেই বলেছেন যে,—এঁদের কখনই সাধারণ মৃত্যু হয় না। তা না হোক, মরদেহ অন্তর্হিত হয়ে যাবে—একথা কেউই স্বীকার করে নেবেন না, নিতেও পারেননি।*" *(পৃঃ ১০৭)*। হায়! তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও যাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনাই অব্যাখ্যাত থেকে যায়, সেই তিনিই কিনা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সশরীরে অন্তর্দ্ধান কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিবেন না বলে পণ করেছেন! এখানে পাণ্ডাজী কি '*বানরের গলায় মুক্তার মালা*'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে গেলেন না? একেই কয় আসুরিক-বৃত্তি বা পাষণ্ডতা। সেই পাষণ্ডচিত্তে অলৌকিকতা কোন লৌকিক ব্যাপারে অসত্য মনে না হলেও কেবল অলৌকিক বিষয়েই তা অসত্য বলে স্থিরীকৃত হয়। "*এ কথা কেউই স্বীকার করে নেবেন না, নিতেও পারেননি*"—এই কথায় পাণ্ডাজী সমগ্র বিশ্বের মানুষকে নিজের মতই পাষণ্ডচিত্ত বলে ঠাউরেছেন; অর্থাৎ অন্তরেও তিনি যেমন পাষণ্ড-স্বভাব, বাইরেও সকলের মধ্যেই সেই পাষণ্ডতা-দর্শন। "*যে যেমন ঢেম্‌নি, পরকে দেখে তেম্‌নি।*"



আর পাষণ্ডদের ভগবদ্-বিষয়ে মন্তব্য বা গবেষণা যে পেঁচার পক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধে মন্তব্য বা গবেষণার মতোই—তার প্রমাণ তো স্বয়ং পাণ্ডাজীই।

জগতে সাধারণ কোন ইন্দ্রজালবিদের পক্ষেই যদি সকলের চোখের সামনেই কোন বস্তুকে এমনকি নিজেকেও অদৃশ্য করা সম্ভব হয়, তবে সমস্ত ঐন্দ্রজালিকেরও যিনি ঐন্দ্রজালিক, সেই ভগবানের পক্ষে সশরীরে অন্তর্দ্ধান কি অস্বীকার-যোগ্য কিছু? শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ-কালে তাঁর দু'দুবার অন্তর্হিত হওয়ার ঘটনা তাঁর জীবনী আলোচনা করলেই ত' দেখা যায়। পাণ্ডাজীদের ত' আবার '*ভক্তিবাদী রচনাগুলির অন্তর্গত অলৌকিক কাহিনীর বহুলতা*' দেখলে মাথা ঘুরে যায়। অগভীর জলের মাছ যেমন গভীর জলে প্রবেশ করলে বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু গুলিয়ে ফেলে—ঠিক সেইপ্রকার। শ্রীচৈতন্যদেবের দেহ সাধারণ জীবের মত শব-রূপে পড়ে না থেকে কিভাবে অদৃশ্য হল, এই মাথাব্যথা দূর করতে পাণ্ডাজী বরং ভারতের বিভিন্ন সিদ্ধমহাত্মা-যোগিগণের জীবনী গবেষণা করলেই পারতেন। যেখানে অষ্টসিদ্ধি-লব্ধ যোগিগণের দেহ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট অদৃশ্য হওয়ার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, তখন সমস্ত যোগেশ্বর-গণেরও পরমেশ্বর, ভক্তযোগিগণের নিত্যধ্যেয়, ধ্যানধারণা-মঙ্গল সচ্চিদানন্দ তনু কি প্রকারে অদৃশ্য হল, তা পারমার্থিক বিদ্যালয়ের এক সামান্য বালকেরও বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু পাণ্ডাজীরা নিজেদের জড়শিক্ষাকেই কেবল শিক্ষা মনে ক'রে সেই পারলৌকিক বিদ্যায় '*ক-অক্ষর গোমাংস*' হয়েই গুরু-বিষয়ে লঘু মন্তব্যের ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন।

**অস্বাভাবিকতা—১১**

পাণ্ডাজীর কাছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা বরং 'বৈষ্ণব-লীলা-মৃত'ই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে—কারণ, তাতে সাল-তারিখ দিয়ে সব বর্ণনা আছে। সাল-তারিখ দিয়ে মিথ্যা দলিল তৈরী হওয়া যে-যুগে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, সে যুগে কেবল সাল-তারিখ দেওয়া বলেই 'বৈষ্ণব-লীলা-মৃতে'র বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপিত হতে পারে না।

কারণ, বিচার করলে দেখা যায়—যেস্থলে গৌড়ীয় ভক্তগণের উৎকলীয়দের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার এবং পশ্চাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কায় রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীরামানন্দের প্রদত্ত বুদ্ধি-অনুসারে মহাপ্রভুকে অত্যন্ত গোপনেই সমাধি দিয়ে পরে তাঁর শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়া রাষ্ট্র করলেন, সেস্থলে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের দুই বৎসর পরেই সেই শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজত্বেই সেই অত্যন্ত গুহ্য সংবাদ, যা প্রকাশিত হয়ে পড়লে অধিক ভুল-বুঝাবুঝি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা উদয় হয়, তা ব্যক্ত ক'রে কিনা ঐ 'লীলা-মৃত' রচিত হয়ে গেল! আর প্রতাপরুদ্র তা জানতেও পারলেন না! যদি বলা হয়—'লীলা-মৃত'কার কেবল নিজের বিবেকের তাড়নাতে সেই অত্যন্ত গুহ্যকথা অত্যন্ত গোপনেই পুঁথিগত ক'রে রেখেছিলেন, তখন কাকপক্ষীটিও টের পায়নি—এবং পরে (হেঁ হেঁ হেঁ বুঝ্‌লে কিনা) পাণ্ডাজীদের মতো গবেষকদের অনুসন্ধানেই এত বৎসর বাদেই তা প্রকাশিত হল। তার উত্তর এই যে,—শ্রুতি-স্মৃতি-ঘোষিত শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা ও অবতারত্ব অপ্রকাশ রাখার দুরাগ্রহটীও কি বিবেকের দংশনে জাত কিছু?

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য বলে পরিচয়-দানকারী সেই 'লীলা-মৃত'-কার নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলার একমাত্র দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা নন। শ্রুতি-স্মৃতি-অনুগত অন্যান্য শ্রীচৈতন্য-চরিতকারগণের থেকে তিনি কেন এত ভিন্ন সংবাদবাহী? তাঁর পুঁথিতে প্রতি পদে পদে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পরিকর-সম্বন্ধে, অত্যন্ত তত্ত্বসিদ্ধান্ত-বিরোধী কথা ও মিথ্যা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী 'তৃতীয় প্রসঙ্গে' (এই গ্রন্থের ৪৯-৫২ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত অংশগুলি স্মরণ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়—পরিকল্পিত ভাবেই ঐ-সব মিথ্যা তথ্য-দ্বারা পাণ্ডাজীরা প্রথম থেকেই তৎকালীন উৎকলীয় ভক্তগণের সাথে গৌড়দেশীয় ভক্তগণের এক তিক্ত-সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরী করতে চেয়েছেন, যার ভিত্তিতেই তাঁরা মহাপ্রভুকে সমাধি দেওয়ার এক বৃথা চেষ্টা করেছেন। হরিভজন-রত নিষ্কপট সাধকগণের চিত্তেই যেস্থলে কোন জাতি-বিদ্যা-ঐশ্বর্য্যগত অভিমান থাকে না, সেস্থলে মহাপ্রভুর সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের



মধ্যে প্রাদেশিকতা-দোষ কল্পনা করা কতখানি অপরাধাসক্ত বজ্রচিত্তের পরিচয়! তারপর যে-প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর '*পুণ্যদেহে*' আকস্মিক এক ক্ষয়-ধর্ম্ম আরোপ ক'রে এবং পথে নৃত্যকালে ইষ্টকাঘাতের ব্যবস্থা-দ্বারা মহাপ্রভুকে রক্তাপ্লুত ও জ্ঞানহারা করিয়ে জবরদস্তি জগন্নাথ-মন্দিরের চত্বরে আনালেন, কেবল একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তিনদিন যাবৎ রেখে প্রাণত্যাগ করালেন এবং মন্দিরের অদূরে 'কোইলি বৈকুণ্ঠে' কাগজে-কলমে সমাধি দিলেন ও সর্ব্বোপরি যেভাবে মহাপ্রভুর গৌড়দেশীয় নিত্যসঙ্গীগণকে পুরীছাড়া করিয়ে কেবল উৎকলীয় ভক্তগণের দ্বারা সম্পূর্ণ কাণ্ডটা ঘটালেন —তাতে পাণ্ডাজীরা কেবল অদ্ভুত হাস্যরসেরই বিষয় হয়েছেন। স্পষ্ট বুঝা যায়, অত্যন্ত পরিকল্পিত-ভাবেই ঐ পুঁথি কলির চরদের সম্মিলিত উদ্দোগে তৎকালীন ইতিহাসের সাথে মিলিয়ে রচিত হয়েছে। বৃক্ষের পরিচয় তো ফলেই।

## দ্বিতীয় অপবাদ—শ্রীচৈতন্যদেব পাণ্ডাগণের দ্বারা নিহত

দ্বিতীয় অপবাদ এই প্রকার যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পুরীর পাণ্ডাগণের দ্বারা 'গুমখুন' হয়েছেন এবং শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরেরই কোন স্থানে প্রোথিত হয়েছেন। ইতোমধ্যে বেশ কিছু লোক গাঁজার কল্কে টেনে বিভিন্ন ছদ্মনামে সেই অপবাদকে নিয়ে অকথ্য কাহিনীও রচনা করেছেন। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার লোক যেমন বহু দেখা যায়, সেইপ্রকার কালকূট-বিষ-ধিক্কারকারী সেইসব অশ্লীল রচনার আত্মঘাতী গ্রাহকেরও অভাব নেই।

## বিভু আত্মা 'ভগবান্' কখনই হননীয় নন

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (২।২৩) স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ-বাণীতেই আত্মার স্বরূপ জানতে পারা যায় যে,—'আত্মা কখনও অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলদ্বারা সিক্ত কিংবা বায়ুতে শুষ্ক হয় না।' আর এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা সেই ভগবান্ সর্ব্ব আত্মারও আত্মা বিভু আত্মা। কেবল তাই নয়, জীবের যেপ্রকারে দেহ ও আত্মার মধ্যে ভেদ থাকে, ভগবৎ-স্বরূপে কিন্তু সেইপ্রকার ভেদ আদৌ থাকে না—"**দেহ-দেহী বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে**

**বিদ্যতে ক্বচিৎ**" (কূর্ম্মপুরাণ)। এস্থলে ক্বচিৎ-শব্দের অর্থ—কখনও নয়। সেই ভগবৎ-স্বরূপ 'গোলোক' বা 'পরব্যোমে' বিরাজিত থাকুন বা এই ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও অবতীর্ণ হন—কখনও জীবের মতো দেহ ও আত্মার পার্থক্য তাঁর থাকে না। অতএব তাঁর হস্ত-পদ সমন্বিত যে 'দেহ'—তা স্বয়ংই এবং সম্পূর্ণই 'বিভু আত্ম-স্বরূপ'। সুতরাং সেই দেহে এই জড়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি-জাত কোন দ্রব্যের গন্ধমাত্রও নেই (কিছু পূর্ব্বেও ৫৪ পৃষ্ঠায় এই অংশটী আলোচিত হয়েছে)। সুতরাং বিভু-আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্ কি-প্রকারে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছিন্ন হতে পারেন, যখন আত্মা-মাত্রই ছেদনীয় নয়?

এই বিষয়ে সংশয় হতে পারে—তাহলে সেই বিভু আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ কিপ্রকারে ব্যাধের তীরে হত হলেন? সে সংশয় দূর করতে স্বয়ং শ্রীশুকদেবই বলেছিলেন—"**মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য**" (ভাঃ ১১।৩১।১১)—অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকের মতোই এটী এক মায়াভিনয় মাত্র। নতুবা যে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিতে সেই জরাব্যাধ তৎক্ষণাৎ সশরীরে স্বর্গগমন করেছিল, যিনি গুরু সান্দীপনির মৃতপুত্রকে যমালয় হতে স্বয়ং আনয়ন ক'রে দক্ষিণারূপে গুরুকে প্রদান করেছিলেন, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে মহাবাহু ভীষ্মের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে যিনি রোমাঞ্চ-গাত্র হয়েছিলেন, সেই তাঁর পক্ষে ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যুবরণ (!) মায়াবিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? জগতে সাধারণ ঐন্দ্রজালিক-গণকেই যেস্থলে দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন ক'রে সর্ব্বসম্মুখেই এক জীবন্ত মানবকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে দেখা যায়, সেস্থলে সমগ্র ঐন্দ্রজালিকেরও যিনি ঐন্দ্রজালিক, সেই শ্রীভগবানের পক্ষে এইপ্রকার মায়াভিনয় কি কিছু মাত্র আশ্চর্য্যের? "**সম্ভবামি আত্মমায়য়া**" (গীঃ ৪।৬)—আত্মভূত-মায়ার দ্বারা যিনি জন্মরহিত হয়েও জন্মগ্রহণের অভিনয় করেছিলেন, সেই আত্মমায়ার দ্বারাই তিনি সেই অদ্ভুত অপ্রকট-লীলাটীও ঘটিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের এক প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীবাদিরাজ-স্বামী তাঁর 'যুক্তিমল্লিকা'-গ্রন্থে বহু যুক্তি তুলে ধরেছেন। বাহুল্যভয়ে সেই গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোক-গুলি উদ্ধার না ক'রে কেবল তার কয়েকটী বঙ্গানুবাদ উল্লিখিত হল,—



☐ যদি জরা-নামক ব্যাধের অস্ত্রাঘাতেই শ্রীকৃষ্ণের বস্তুতঃ মৃত্যু হতো, তবে সেইকালে তাঁর উদরস্থ জগৎ সকলেরও মৃত্যু ঘটতো। কারণ, শাস্ত্রে বিষ্ণুর উদরেই ব্রহ্মাণ্ডের স্থান, বলা হয়েছে।

☐ পিশাচ-দ্বারা আবিষ্ট হলে সেই দেহ খড়্গ-দ্বারা ভিন্ন হতে দেখা যায় না। আবার মন্ত্রদ্বারা কোন খড়্গের তীক্ষ্ণতা প্রতিহত করা হলে তদ্দ্বারাও কোন বস্তু ছিন্ন হয় না। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ ছিন্ন হয়েছিল বললে পিশাচ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ অল্প শক্তিসম্পন্ন হন এবং সমস্ত বেদ-মন্ত্রে অভিজ্ঞ ভগবানেও সর্ব্বজ্ঞত্বের লোপ ঘটে—বলতে হয়।

☐ ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর ভেদ করতে যাঁর নখমাত্রও ছিন্ন হয় না, ব্যাধের বাণাঘাতে তাঁর শরীরছেদ কিরূপে সম্ভব হতে পারে?

☐ বিষ্ণুর রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডরাশি বিদ্যমান থাকে, অতএব তাঁর রোমছেদ মাত্রেই জগতেরও ছেদ হতে পারে।

☐ "**ন ঋতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে**"—এই শ্রুতিবাক্যে ছেদন-ভেদন সকল ক্রিয়াতেই ভগবান্‌কে নিয়ামকরূপে জানা যায়; অতএব অন্য কে সেই পুরুষোত্তমকে ছেদন করতে পারে?

☐ দক্ষযজ্ঞে বিষ্ণুর আহুতি প্রদত্ত হবার পূর্ব্বেই সতী দেহত্যাগ করলে ক্রুদ্ধ রুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারাও যখন দক্ষের মস্তক ছেদন করতে পারেন নি, তখন বিস্মিত হয়ে দীর্ঘকাল ধ্যান করে জানলেন—দক্ষের শিরচ্ছেদ হলে বিষ্ণুর আহুতি লোপ হবে, অতএব তাঁর শিরচ্ছেদ বিষ্ণুর অভিপ্রেত নয় বলেই দক্ষমস্তক অচ্ছেদ্য হয়েছে। অতএব এইপ্রকার যে বিষ্ণু, তাঁকে কে ছেদন করতে পারে? (অতঃপর রুদ্র—'আমি স্বয়ংই দক্ষকে বিষ্ণুর আহুতির জন্য পশুরূপে পরিণত করব'—এইরূপ উপায় নির্ণয় ক'রে পশ্চাৎ তাঁর শিরচ্ছেদ করেছিলেন।)

☐ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অস্ত্র-অগ্নি-ভৃগুপাত-মত্তহস্তী প্রভৃতির দ্বারা বিনাশে প্রবৃত্ত হলেও ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবেই প্রহ্লাদ সর্ব্বদা রক্ষিত ছিলেন; অতএব যিনি কৃপামাত্রেই ভক্তজনের ছেদনাদি নিবারণ করেন, তিনি স্বয়ং কিরূপে ছিন্ন হতে পারেন?

সুতরাং সৎযুক্তির আশ্রয়েই শাস্ত্রীয় বাক্যসকল বিচার করতে হয়, নতুবা শাস্ত্রবাক্য আশ্রয় করেও ধর্ম্মহানি ঘটে যেতে পারে।

**"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।**
**যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"**

মহাভারতাদি-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের যে দেহত্যাগ-প্রসঙ্গ বলা আছে, তাতে এক শাস্ত্র ও যুক্তি-বিষয়ে নিরেট মূর্খছাড়া আর কেহই মোহিত হন না। প্রকৃতপক্ষে মহাবল বালীর পুত্র অঙ্গদের প্রতি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রদত্ত বচন-অনুসারেই দ্বাপর-লীলায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেই ব্যাধরূপী অঙ্গদের দ্বারা এইপ্রকার অসুরমোহন-লীলা ঘটিয়েছিলেন। নতুবা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবামনদেব, শ্রীবরাহদেব, শ্রীনৃসিংহদেব কিংবা কোন ভগবৎ-স্বরূপেই এইপ্রকার অদ্ভুত লীলা-সঙ্গোপন দেখা যায় না।

## ভগবানের বিরুদ্ধে আসুরিক বৃত্তির কোনপ্রকার ফলপ্রসূতা নাই

আসুরিক স্বভাব-বশতঃ ভগবানের বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ দ্রোহাচরণ ঘটনা প্রায়শঃ হতে দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সেই স্বভাববশে ভগবান্‌কে হত্যা করে ফেলা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। ভগবান্ বরাহদেবের কাছে হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে পর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর রক্তে তর্পণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিল। ব্রহ্মার বরে সেই অসুরপতি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও বিশ্বত্রাস বলবান্‌রূপে পরিণত হলেও কার্য্যতঃ তাকেই শ্রীহরির নিকট হত হতে হয়েছিল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধে কাশীরাজের পুত্র 'সুদক্ষিণ' স্বয়ং মহাদেবের উপদেশে অভিচার-যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিল। সেই যজ্ঞকুণ্ড হতে শূলধারী এক বিশাল অগ্নিমূর্ত্তি প্রকটিত হয়ে সুদক্ষিণের আদেশে যখন দ্বারকাভিমুখী হয়, তখন পথিমধ্যেই সুদর্শন-চক্রের দ্বারা প্রতিহত হয়ে সেই অগ্নিমূর্ত্তি বারাণসীপুরী ফিরে আসে এবং যজ্ঞের সকল পুরোহিতসহ রাজা সুদুক্ষিণকেও দগ্ধীভূত করে। এইপ্রকারে অসুরদের যাবৎ ভগবদ্বিরোধী প্রয়াস এবং কোন কোন স্থলে দেবতাগণের বরে পুষ্ট হয়েও তাদের সকলপ্রকার ভগবদ্রোহিতা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছিল। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎবাণী এইপ্রকার—"হে পার্থ! আমাকে



সর্ব্বভূতের সনাতন-বীজরূপে জানবে, এমন কি বুদ্ধিমানের যে বুদ্ধি, তেজস্বি-গণের যে তেজ, বলবান্ সকলের যে বল, সেটীও কিন্তু আমিই।' (গীঃ ৭।১০); আবার 'দেবতাগণের আরাধনা ক'রে যে যে অভীপ্সিত বর লাভ হয়, তাও কিন্তু আসলে আমাদ্বারাই বিহিত হয়ে থাকে' (গীঃ ৭।২২)। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে বা দেবতাগণের থেকে লাভ করা সেই বুদ্ধি, সেই তেজ, সেই বল নিয়ে পুনরায় সেই ভগবানকেই আক্রমণ অবশ্যই চলতে পারে না। *'যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া*—প্রবাদবাক্যটী আর যে ক্ষেত্রে হোক্ ভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না। আসুরিক স্বভাবে কেউ যদি সে-প্রকার প্রয়োগে প্রয়াসী হয়, তবে সেকালে বুদ্ধিমানের বুদ্ধি লোপ পায়, তেজস্বী নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং বলবানের বল অপহৃত হয়।

## মহাপ্রভুর প্রতি বৌদ্ধাচার্য্য ও ভট্টথারিদের নিষ্ফল আক্রমণ

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও এইপ্রকার কতিপয় আসুরিক প্রয়াস ঘটেছিল। সেইসকল ঘটনা আলোচনা করলে তাঁর অচিন্ত্যশক্তিমত্তা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা লাভ হয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে একসময় এক পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্য সগর্ব্বে এবং সশিষ্য মহাপ্রভুর কাছে অবৈদিক শূন্যবাদকে স্থাপন করতে এসেছিলেন। কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্রকে তর্কের বিচারেই খণ্ড-বিখণ্ড করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বৌদ্ধগণ সকলে মিলে কুমন্ত্রণা করে বিষপ্রযুক্ত অপবিত্র অন্ন মহাপ্রভুকে ভোজন করতে দিয়েছিলেন। আর তার প্রতিফল কি হল, দেখুন—

**"হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।**
**ঠোঁটে করি' অন্নসহ থালি লঞা গেল॥**
**বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।**
**বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥**
**তেরছে পড়িলা থালি, মাথা কাটি গেল।**
**মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥"**

(চৈঃ চঃ ২।৯।৫৪-৫৬)

পুনরায় সেই ভ্রমণ-সময়েই যখন মহাপ্রভু ক্রমে দক্ষিণের মালাবার প্রদেশে এসে পৌঁছালেন, তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গী তরলমতি কৃষ্ণদাস তখন সে-স্থানের উচাটন-বশীকরণে পারদর্শী ভট্টথারিদের কবলে পড়ে গিয়েছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভট্টথারিদের গৃহে এসে তাঁর সঙ্গীকে ফিরিয়ে দিতে প্রার্থনা করলেন। প্রত্যুত্তরে সেই হিংস্র ভট্টথারিরা অস্ত্র নিয়ে ধাবিত হল মহাপ্রভুকেই আক্রমণ করতে। কিন্তু দেখা গেল—সেই অস্ত্রসকল তাদের অঙ্গেই প্রতিঘাত-রূপে পর্য্যবসিত হল; তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভট্টথারিরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করল—

**"শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।**
**মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা॥**
**তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।**
**খণ্ড খণ্ড হৈল, ভট্টথারি পলায় চারিভিতে॥"**

(চৈঃ চঃ ২।৯।২৩১-২৩২)

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে তর্কের খাতিরে যদি ধরাও হয় যে, পুরীর পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল—তাতেও তাদের পরিণতি যে সেই বৌদ্ধাচার্য্য বা ভট্টথারিদের মতোই হতো—এতে নিশ্চয় কোন সংশয় থাকে না।

## সমুদ্র-নিমজ্জিত মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিমত্তা প্রকাশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর এক অত্যাশ্চর্য্যজনক লীলা শ্রবণ করুন—যাতে তাঁর অচিন্ত্য-শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে একসময় মহাপ্রভু চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত সমুদ্রের দর্শনে কৃষ্ণলীলা-ময়ী যমুনার উদ্দীপনে হলেন ব্যাকুলিত—আর তখনই কোন এক উজ্জ্বল-নীলমণির অদম্য আকর্ষণে মন থেকেও দুর্ব্বার গতিতে ধাবিত হয়ে তিনি ঝাঁপ দিলেন সমুদ্র বক্ষে—ভাব-তরঙ্গের অশান্ত দোলায় আরূঢ় হয়ে মহাপ্রভু প্রবেশ করলেন একেবারে প্রেমসিন্ধু-গর্ভমাঝে। আর এদিকে স্বরূপ-দামোদরাদি যত ভক্তগণ, সকলে সমস্ত রাত্রি কেউ সমুদ্রের তীর, কেউ জগন্নাথ মন্দির, কেউ গুণ্ডিচা



মন্দির, কেউ বা জগন্নাথবল্লভ-উদ্যান—প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও তাঁকে না পেয়ে তাঁরা সকলে—"**অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু—নিশ্চয় করিল।**" (তত্ত্ববেত্তা সেই ভক্তগণ শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ সবজান্তা মূর্খদের মতো তিনি 'মারা গেছেন'—এইপ্রকার মনে ক'রে বসেন নি।) অবশেষে পরদিন এক ধীবরের জালে মহাপ্রভু অচেতন-অবস্থায় উত্তোলিত হলেন। পূর্ব্বে বহুবার সেই ধীবরের ভাগ্যে মহাপ্রভুর দর্শন হয়েছিল, তথাপি এইবার অস্থি-সন্ধি-বিচ্ছিন্ন দীর্ঘাকার মূর্ত্তি দর্শন ক'রে মহাপ্রভুকে সে আর চিনে উঠতে পারল না। কিন্তু সেই প্রেমে মুহ্যমান অঙ্গের স্পর্শেই ধীবরের দেহে অনায়াসে ভক্তসাধক-গণের পরমাকাঙ্ক্ষিত অশ্রু, পুলক, রোমাঞ্চ, কম্প—প্রভৃতি সুদুর্ল্লভ সাত্ত্বিক ভাবরাজি বিরাজিত হতে লাগল। কিন্তু অজ্ঞ ধীবর মহাপ্রভুকে 'ভূত' মনে ক'রে নিজের সেই কৃষ্ণপ্রেমোদয়কেও 'ভূতে পাওয়া'র লক্ষণ বলেই মনে ক'রে বসল। স্বরূপ দামোদর তাকে সমস্ত-প্রকারে অভয় প্রদান ক'রে বললেন— "**যাঁরে তুমি কর ভূত জ্ঞান।**

**ভূত নহে—তেঁহ কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥**
**তাঁর স্পর্শে হইল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।**
**ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥"**

(চৈঃ চঃ ৩।১৮।৬৪, ৬৬)

অতঃপর সকলে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করলে সেই ধ্বনিতে মহাপ্রভু ক্রমশঃ বাহ্যদশায় এসে উপনীত হলেন।

সৌভরিমুনি যোগবলে জলমধ্যে স্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'রে সেস্থানে অযুত-বর্ষ তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলায় তাঁর কোন যোগ-প্রচেষ্টা ঘটেনি—পরন্তু সেই বিভু-আত্মস্বরূপেরই এক সামান্য ধর্ম্মের সাধারণ অভিব্যক্তি মাত্র ঘটেছে। গীতায় কথিত "**ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ**" (গীঃ ২।২৩)—'আত্মা জলে সিক্ত হয় না'—এই বাণীরই অতি স্বাভাবিক এক প্রকাশ বস্তুধর্ম্ম-বলেই মাত্র সংঘটিত হয়েছে, প্রেমাস্বাদন-লীলাপর মহাপ্রভুর সেজন্য পৃথক্ যোগাবলম্বনের কোন প্রয়োজনই হয়নি।

**"যদ্ভয়ান্ মৃত্যুঃ প্রধাবতি"** (ভাঃ ৮।২।৩৩), **"ন যত্র কালো বিশতে ন বেদঃ"** (ভাঃ ৮।১২।৪৪), **"যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্"** (ভাঃ ১।১।১৪)—পুরাণসূর্য্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং যাবৎ শাস্ত্রেই এইপ্রকারে উদ্ঘোষিত হয়েছে যে, মৃত্যু, কাল, এমন কি স্বয়ং ভয়ও সেই পুরাণপুরুষ-ভগবান্ হতে ভীত হন। যাঁর ইচ্ছামাত্রেই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুলুকপতি কাজীর প্রাণনাশকর উৎপীড়নেও সুরক্ষিত ছিলেন (চৈঃ ভাঃ আদি ১৬ অঃ), যাঁর বাক্যে শ্রীশ্রীবাসের মৃতপুত্র পর্য্যন্ত মুখর হয়ে সর্ব্বসম্মুখে তাঁর ছন্নাবতারত্ব কীর্ত্তন করে উঠেছিল, (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৫ অঃ), যাঁর আলিঙ্গন-স্পর্শেই 'দণ্ডক'-অরণ্যের ত্রেতাযুগীয় 'সপ্ততালবৃক্ষ' সশীরে বৈকুণ্ঠ যাত্রা করেছিল (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ পঃ), সেই অচিন্ত্যশক্তিময় শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে এইপ্রকার ভীষণ অপবাদ প্রচারের দুরাগ্রহ অহো কি-প্রকার আসুরিকতা!

## মহাপ্রভু এবং নীলাচলবাসিগণ

শ্রীচৈতন্য-বিরোধীরা পুরীর যে পাণ্ডাগণের দ্বারা গুমখুনের গল্প খাড়া করেছেন, শ্রীচৈতন্যানুগত এবং তৎপূজারী সেই পাণ্ডাগণ সে-অপবাদ মেনে নেবেন কি? পাণ্ডাগণ তথা নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ এবং সর্ব্বোপরি তৎকালীন উৎকলরাজের সাথে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিপ্রকার গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, তা আলোচনা করলেই সেই বিরোধীদের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হয়ে যায়। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যখন মহাপ্রভু নীলাচল-ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তিনি শ্রীসার্ব্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত এক ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণ করলেন। সার্ব্বভৌম তদানীন্তন ভারতে 'ন্যায়' ও বেদান্ত শাস্ত্রের অন্যতম সুবিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজপণ্ডিত ও দক্ষিণ হস্ত। তিনি তাঁর নবদ্বীপবাসী ভগ্নিপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের সাথে বহু বাদানুবাদের পর মহাপ্রভুর অবতারত্ব-বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ তো পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। পরে বেদান্ত-বিষয়ে সাক্ষাৎ আলোচনার কালে তাঁকে যখন মহাপ্রভু তাঁর ছয়প্রকার পূর্ণ-ঐশ্বর্য্যের অন্যতম জ্ঞানৈশ্বর্য্য দর্শন করালেন,



তখন তাঁর আর মহাপ্রভুর ভগবত্তা-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ শ্রীভট্টাচার্য্য তখন নিজের দাম্ভিকতাকে নিন্দা করতে করতে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হলে মহাপ্রভু তাঁকে নিজ ষড়্ভুজ-রূপ দর্শনের দ্বারা কৃতকৃতার্থ করেছিলেন।

সেই শ্রীসার্ব্বভৌমের মত একজন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা প্রামাণিক ব্যক্তিকে যখন মহাপ্রভুর ভগবত্তাকে অসঙ্কোচে স্বীকার করতে দেখলেন ও নিজ স্বভাব-গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ ক'রে তাঁর সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে উন্মত্ত হতে দেখলেন, তখন স্বয়ং রাজা এবং সমগ্র নীলাচলবাসী মহাপ্রভুকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপে জানতে পারলেন।

**"লোহাকে যাবৎ স্পর্শী হেম নাহি করে।**
**তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥**
**ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন।**
**প্রভুকে জানিল—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"**

(চৈঃ চঃ ২।৬।২৭৯-২৮০)

অতঃপর সেই নীলাচলবাসিগণও মহাপ্রভুর কৃপালাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে যখন ভট্টাচার্য্যের শরণাপন্ন হলেন, তখন তাঁদের সেই আর্ত্তি দেখে ভট্টাচার্য্য তাঁদের জন্য মহাপ্রভুর কাছে আবেদন করলেন,—

তবে সার্ব্বভৌম, প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি'।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
"এইসব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে॥
**তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।**
**তৈছে এসব—সবে কর অঙ্গীকার॥"**

(চৈঃ চঃ ২।১০।৩৮-৪০)

পুরীর পাণ্ডাগণ সেই ধন্য নীলাচলবাসিগণের মধ্যেও পরমধন্য—যাঁরা নীলাচল-নাথ শ্রীজগন্নাথদেবেরই বিভিন্ন সেবায় নিত্য নিযুক্ত,

শ্রীজগন্নাথের সেবাই তাঁদের একমাত্র ধন, জীবন ও আত্মার আত্মা। সেই পাণ্ডাগণ বংশ-পরম্পরায় ব্রহ্মার পঞ্চম অধস্তন শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের সময় থেকেই রাজার আজ্ঞাবাহী দাস। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্বয়ং আবেদনে যে-সকল পুরুষোত্তমবাসী মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রীজগন্নাথের সেবক; সুবর্ণ বেত্রধারী—কৃষ্ণদাস, লিখন-অধিকারী—শিখি মাহিতি, মহাসূপকার—প্রদ্যুম্ন মিশ্র, প্রহররাজ—পরমানন্দ মহাপাত্র, জগন্নাথের অঙ্গসেবনকারী—জনার্দ্দন প্রমুখ বিভিন্ন জগন্নাথ-সেবকগণ সকলেই হয়েছিলেন গৌর-কৃপায় পরিপুষ্ট। যে পড়িছাগণ মহাপ্রভুর প্রথম জগন্নাথ-দর্শনকালে জগন্নাথ-আলিঙ্গনে উদ্যত হওয়ায় অজ্ঞতাবশে তাঁর প্রতি মারমুখ হয়েছিলেন, সেই তাঁরাও মহাপ্রভুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার উপরে তাঁদেরকে স্বয়ং রাজাই মহাপ্রভুর আজ্ঞা শীঘ্র পালনের আদেশ করায় তাঁদের জন্য সোনায় সোহাগা হয়েছিল।—

পড়িছা কহে—"**আমি সব সেবক তোমার।**
**যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার॥**
**বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।**
**প্রভুর আজ্ঞা যেই শীঘ্র করিবারে॥**"

(চৈঃচঃ ২।১২।৭৪-৭৫)

কেবল আজ্ঞা-পালনই নয়, মহাপ্রভু প্রকাশ্যে যদি কোন আদেশও না করেন, তথাপি কেবল তাঁর হৃদ্‌গত ইচ্ছাটি বুঝেই যেন তাঁরা তা সম্পন্ন করেন—সেটীও রাজা পড়িছাগণকে পরিষ্কার নির্দ্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন।

"**প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হইয়া।**
**আজ্ঞা নহে, তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥**" (চৈঃ চঃ ২।১১।১২২)

সেই হতে তাঁরা মহাপ্রভুর জন্য জগন্নাথের প্রসাদী মাল্য চন্দন ও মহাপ্রসাদের নিত্য ব্যবস্থা, গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের ঘটাদি সংগ্রহ, মহাপ্রভুর দর্শনার্থী গৌড়-দেশীয় ভক্তগণের জন্য বাসস্থান, মহাপ্রসাদ, স্বচ্ছন্দ জগন্নাথ-দর্শনের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন সেবায় তাঁরা নিত্য নিযুক্ত থাকতেন।



সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেই ধন্য পুরুষোত্তমবাসিগণ সকলেই এককথায় মহাপ্রভুগত-প্রাণ ছিলেন। অথচ মহাপ্রভু কেবল পারমার্থিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনপ্রকার কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক কোন বিষয়েই ক্ষণকালের জন্যও নিযুক্ত থাকতেন না। বৈষয়িক কোন কার্য্য-সম্বন্ধে তাঁর নিকট কেউ আগমন করলে তিনি বরং বিরক্ত হয়ে পুরী ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। আর এতে সকলেই অত্যন্ত ব্যাকুল ও শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সাথে তাঁদের যে-সম্পর্ক, তা ছিল সম্পূর্ণই পারমার্থিক—জাগতিক লাভালাভের কোন গন্ধমাত্রও সেই সম্বন্ধে ছিল না। এই অবস্থায় মহাপ্রভুর প্রতি তাঁদের কোনপ্রকার দ্বেষ পোষণের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। বরং তাঁরা কি রাজ-অমাত্যগণ, কি জগন্নাথ-সেবকগণ, কি অন্যান্য নীলাচলবাসী, এমনকি জগন্নাথ-দর্শনার্থী যত যাত্রিক লোক—সকলেই মহাপ্রভুর সপরিকর সেই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য ও অলৌকিক ভাবরাশি দর্শন ক'রে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত হয়ে যেতেন—

"**জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।**
**যাত্রিকলোক, নীলাচলবাসী যত জন॥**
**প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।**
**কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার॥**" (চৈঃ চঃ ২।১৩।১৭৫)

যাঁর দর্শনের অদ্ভুত প্রভাবে ঝারিখণ্ডের হিংস্র ব্যাঘ্র, সর্প, শূকর প্রভৃতি সকল পশুপর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম উচ্চারণ-সহ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল (চৈঃ চঃ ২।১৭পঃ), যাঁর অদ্ভুত প্রেমচেষ্টা কেবল শ্রবণ ক'রেই মদ্যপ যবনরাজের চিত্ত প্রেমে বিগলিত হয়েছিল (চৈঃ চঃ ২।১৬পঃ), যাঁর অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য দূর হতে দর্শন-শ্রবণ ক'রেই গৌড়-রাজ হুসেন শাহ ব'লে উঠেছিলেন,—

"**হিন্দু যাঁরে বলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।**
**সে-ই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥**" (চৈঃ ভাঃ৩।৪।৫৫)

যাঁর সামান্য দূরদর্শনেই জীবের দেবদুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হত—"**এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে। কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূরদর্শনে॥**" (চৈঃ চঃ

২।৬।১২১), সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীর্ঘ ১৮ বৎসর নীলাচলে অবস্থানের ফলে পরমধন্য নীলাচলবাসিগণের যে কি-প্রকার অবস্থা হয়েছিল, তা যাঁদের মনুষ্যোচিত চেতনা আছে, তাঁরা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করেন। সেক্ষেত্রে সেই নীলাচলবাসী জগন্নাথ-সেবকগণের দ্বারা জবরদস্তি শ্রীচৈতন্যদেবের বিরোধিতা করালে ইতিহাসকে জঘন্য-রূপেই বিকৃত করা হয়। বোধ করি এইজন্যই 'Samuel Butler' মহোদয় মন্তব্য করেছিলেন—'God can not alter history but the historians can.'—ভগবান্ ইতিহাস পরিবর্ত্তন করতে পারেন না, যা ঐতিহাসিকগণ পারেন।

## মহাপ্রভু এবং উৎকল রাজা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি গঙ্গাবংশীয় (গজপতি) উৎকল সম্রাট্ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের যে শতকরা শতভাগ আকর্ষণ, তা একটী অবিসংবাদিত তথ্য। রাজদর্শন করবেন না বলে মহাপ্রভু যে স্থলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রাজা প্রতাপরুদ্রও সেস্থলে তাঁর কৃপাধন লাভ না হলে নিজজীবন পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্পিত। তাঁর কৃপা-বিনা রাজার রাজ্য—মরুময়, দেহ—অন্তঃসারশূন্য।

> ''**তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোর না করিবে দরশন।**
> **মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥**
> **যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।**
> **কিবা রাজ্য, কিবা দেহ—সব অকারণ॥**" (চৈঃ চঃ ২।১১।৪৮-৪৯)

মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর এই যে সুতীব্র আকর্ষণ—এরও একটী সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, —''পুরাকালে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ নামে যিনি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান সেবক ছিলেন, অর্থাৎ যাঁর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পরব্রহ্ম দারুব্রহ্মরূপে জগতে প্রকটিত হয়েছিলেন, অধুনা তিনিই প্রতারুদ্ররূপে জাত হয়েছেন।✶ সুতরাং প্রতাপরুদ্র কলিযুগের ভোগ-বিলাসোন্মত্ত কোন সাধারণ রাজা ছিলেন না—তিনি ছিলেন

✶ ''ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা॥" (গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১১৮)



সত্যযুগীয় 'রাজর্ষি'। তার অপেক্ষাও বড় পরিচয়—তিনি একজন ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ।

তিনি এতই মহাপ্রভুগত প্রাণ ছিলেন যে, শ্রীরায়রামানন্দ যখন রাজার নিকট শ্রীচৈতন্যচরণ-সেবার বাসনায় রাজকার্য্য হতে অবসরের প্রার্থনা করেছিলেন, তখন শ্রীরায়-রামানন্দের মত একজন অতিপ্রিয়, পরম বিশ্বস্ত, বিশেষ অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ভৃত্যকেও রাজা তৎক্ষণাৎ কেবল শ্রীচৈতন্য-দেবের নামের সুবাদেই দক্ষিণ কলিঙ্গ-প্রদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বের পদ থেকে পূর্ণ বেতনসহ অবসর প্রদান করেছিলেন; অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদসেবাকে তিনি প্রদেশ-শাসন অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নিজ-দায়িত্বাধীনই একটী বিশেষ কার্য্য জ্ঞান করে শ্রীরামানন্দের জন্য পূর্ণ বেতনই বহাল রেখেছিলেন। (অপরদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর সেবাভিলাষে রাজকার্য্য হতে অবসর প্রার্থনা করলে হুসেন শাহ তাঁকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করেছিলেন।) অতঃপর তিনি কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায়, বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতির মাধ্যমে মহাপ্রভুর সেবা-বিষয়ক যাবৎ সংবাদ সর্ব্বদা তাঁর নখদর্পণে রাখতেন এবং দূর থেকেই সেইসকল সেবার পরিপাট্য ও ঔজ্জ্বল্য বিধান করতেন। অবশেষে তিনি তাঁর সেই প্রেমাস্পদের পরমাকাঙ্ক্ষিত ও প্রেমসম্পৃক্ত 'আলিঙ্গন' লাভ করেছিলেন—রাজবেশে নয়, অত্যন্ত দীনহীন ভাবে—কোন জাগতিক উপঢৌকন দিয়ে নয়, কৃষ্ণবিরহ-কাতরা গোপীগণের আস্বাদিত কৃষ্ণগুণ-গাথামৃত পান করিয়ে। আর এতে তিনি নিজকে মহাপ্রভুর দ্বারা অঙ্গীকৃত জেনে তাঁর সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

## উৎকল-রাজের তীব্র বিরহই মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রমাণ

এইপ্রকারে স্বয়ং রাজা নিজপুত্রসহ মহাপ্রভুর নিকট আত্মবিক্রীত হতে পেরে সর্ব্বদা কৃতকৃতার্থ ছিলেন। অতঃপর প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর পুরীতে অবস্থান-কালেই পুত্রকে রাজকার্য্য সমর্পণ ক'রে নিরন্তর সার্ব্বভৌম, রামানন্দ সঙ্গে গৌরগুণ-কীর্ত্তনেই মগ্ন থাকতেন। দিবারাত্র তাঁর যেমন পরমানন্দে অতিবাহিত হত, তেমনই আবার অকস্মাৎ তিনি মহাপ্রভুর জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায়

কখনও তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। এমন সময় মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বার্ত্তা যেইমাত্র রাজার কর্ণগোচর হল, তখনই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে ধরণীতে লুটিয়ে পড়লেন। রামানন্দের কৃপায় তিনি জীবনধারণ করলেও নীলাচলবাসই তাঁর জন্য দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠল। কারণ যে মহাপ্রভুর নীলাচলভিন্ন অন্যত্র অবস্থান রাজা কিছুতেই মেনে নিতে পারতেন না, সেই প্রাণনাথের চির অদর্শন তিনি কিভাবে সহ্য করবেন?—

''বাসুদেব সার্ব্বভৌম রামানন্দ-সনে।
নিরন্তর মগ্ন প্রভুর চরিত কীর্ত্তনে॥
পরম আনন্দে দিবারাত্র গোঙাইতে।
অকস্মাৎ উদ্বেগে নারয়ে স্থির হইতে॥
**হেনকালে প্রভু-অদর্শন কথা শুনি'।**
**অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী॥**
শিরে করাঘাত করি' হৈল অচেতন।
রায়-রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥
প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কতদূরে॥'

(ভক্তিরত্নাকর ৩য় পরিচ্ছেদ)

শ্রীকবিকর্ণপূর রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোয়ম্'-নাটকের প্রারম্ভেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রবল গৌর-বিরহ-কাতরতার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে।✶ বস্তুতঃ

✶ ''**সোঽয়ং নীলগিরীশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা**
**তে তে দিগ্‌বিদিগাগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ।**
**আরামাশ্চ ত এব নন্দনবন-শ্রীণাং তিরস্কারিণঃ**
**সর্ব্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে॥**'' (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ ১।৩)

সেই নীলগিরি, জগন্নাথ হরি, সেই বৈভব সুস্থির।
সেই রথযাত্রা, নির্গুণ গুণ্ডিচা, সেই দর্শনার্থী ভিড়॥
নিন্দি' ইন্দ্রবন, সেই উপবন, প্রতাপও সেই আমি।
সকলই আছে, তবু শূন্য লাগে, বিনা সেই গৌর স্বামী॥



সেই নাটকটীর অবতারণার মূলেই সেই গৌরবিগ্রহ। সংক্ষেপে নাট্যকার বর্ণিত সেই নাটক-রচনার প্রাগ্‌ভূমিকাটী এইপ্রকার—'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের তিরোধানে বিরহজ্বরে জর্জ্জরিত রাজা প্রতাপরুদ্র আমাকে মহাপ্রভুর গুণপরিমল-বাসিত কোন এক আনন্দপ্রদ নাটক রচনার আদেশ করেন,—কারণ, প্রাণপ্রিয়ের যশঃকীর্ত্তন কোন সুহৃৎমুখে কীর্ত্তিত কিংবা অভিনীত হওয়া ছাড়া সেই বিরহবেদনা উপশমের আর কোন উপায় নেই। যাঁর নির্ধূম প্রতাপানলের প্রচণ্ড উত্তাপ দশ-দিশাতেই অনুভূত, যিনি সাধুগণের সুখদাতা কিন্তু বিপক্ষীয়দের জন্য পতঙ্গ-দাহী ভীষণ অগ্নিতুল্য, আজ শ্রীগৌর-বিরহাগ্নিতে স্বয়ংই সন্তপ্ত সেই প্রতাপরুদ্রের আনন্দবিধান-মানসে আমি **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়**-নামক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।'

এইস্থলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের শ্রীচৈতন্যবিরহে মূহ্যমান্ অবস্থাটী বিশেষ লক্ষিতব্য। লক্ষিতব্য কবিকর্ণপূরের এই কথাটী—'যিনি সাধুগণের সুখদাতা, কিন্তু বিপক্ষীয়দের জন্য পতঙ্গ-দাহী ভীষণ অগ্নিতুল্য।' অতএব মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান না হয়ে যদি ঘটনাটী পাষণ্ড-প্রলাপের অনুরূপই হতো, তাহলে প্রতাপরুদ্র সেকালে নিশ্চয়ই বিরহকাতর না হয়ে ভীষণ রৌদ্র মূর্ত্তিই ধারণ করতেন—তাঁর সেই প্রচণ্ড 'প্রতাপানল' সেস্থলে জ্বলিত হয়ে কি তৎক্ষণাৎ বিরোধীদের পতঙ্গবৎ দগ্ধীভূত করতো না? প্রাণারামের প্রতি আক্রমণে কোন্ সমর্থবান্ পুরুষ কেবল বিরহে কাতর হয়ে থাকেন? সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু (!) সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত যাবতীয় প্রচার এক প্রবল বিদ্বেষ-প্রসূত ছাড়া আর কিছুই নয়।

## মহাপ্রভুর সমাধিস্থল নিয়ে পাষণ্ডদের ঘৃণ্য মত ও মতানৈক্য

পুনরায়, অন্য কোন পাষণ্ডদলের প্রচার যে, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র গৌরলীলার নিত্যত্ব বা গৌরচন্দ্রের ভগবত্তা স্থাপনের জন্যই মহাপ্রভুর দেহ গুণ্ডিচা মন্দিরে (নাকি গম্ভীরায়, নাকি খোদ জগন্নাথ-মন্দিরেই) কয়েকজন পাণ্ডার সাহায্যে অন্যান্য গৌর-পার্ষদগণের অলক্ষ্যেই সমাহিত করে—''তিনি জগন্নাথে লীন হয়েছেন''—এই কথা রাষ্ট্র করেছেন। ভগবানের লীলার

নিত্যত্ব বলতে এইসকল পাষণ্ডরা তাদের ষণ্ড-বুদ্ধিতে যে-প্রকার বুঝে থাকেন, তার নমুনা কিছু বৎসর পূর্ব্বেও কোন এক 'ব্রহ্মচারী বালক'কে 'অবতার'-রূপে খাড়া করবার উদ্দেশ্যে তার পচনশীল মরদেহ উধাও করে অন্য এক সদৃশ-'বালক'কে তৎস্থলাভিষিক্ত করার নিষ্ফল প্রয়াসেই লক্ষিত হয়। মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাদের মত কোন গণগড্ডালিকায় বাহিত হয়ে শ্রীগৌরচন্দ্রে ভগবত্তা স্থাপনের কিছু হুজুগে মেতে উঠেন নি, যে তাঁর লীলার নিত্যত্ব প্রচার করতে মহারাজকে সেইপ্রকার কোন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে। পরম শাস্ত্রবেত্তা শ্রীপ্রতাপরুদ্র তৎকালীন সেই পণ্ডিতাভিমানীদের অসার-গ্রাহিতা লক্ষ্য ক'রে বরং স্তম্ভিত হয়েছিলেন—

**''রাজা কহে, শাস্ত্র-প্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।**
**তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ॥''** (চৈঃ চঃ ২।১১।১০১)

ভগবানের 'অলাতচক্রবৎ-লীলা'✶ তাঁর 'লীলাশক্তি'-নামক এক বিশেষ অন্তরঙ্গা-শক্তি দ্বারাই এক ব্রহ্মাণ্ড হতে অন্য ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব' সংঘটনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে—সেস্থলে কোন মহারাজ বা পাণ্ডার কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। গৌরৈকপ্রাণ গজপতি মহারাজ যে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত এক বহির্ব্বাস লাভ ক'রে পরমানন্দ-সাগরে মগ্ন হয়ে সেই বস্ত্রখণ্ডটীকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু-জ্ঞানে পূজা করতেন—

**''বস্ত্র পাইয়া রাজার হৈল আনন্দিত মন।**
**প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন॥''** (চৈঃ চঃ ২।১০।৩৮)

✶ ''অলাতচক্র-প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে। সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥'' (চৈঃ চঃ ২।২০।৩৯৩); কোন জ্বলিত অঙ্গার ঘূর্ণায়মান হলে যে-প্রকার এক আলোর চক্র দৃষ্ট হয়, সেইপ্রকার ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিক্রমে সকল ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলাচক্র সংঘটিত হয়ে থাকে। ভগবানের নিত্যলীলা এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়ে প্রথম-ক্ষণ-শেষে দ্বিতীয়ক্ষণ আরম্ভ হলে পর প্রথম-ক্ষণ-সম্বন্ধিনী লীলা তখন অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হয়। এইরূপ সকল ভগবৎ-স্বরূপ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় লীলা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদাই বিরাজমান। পরব্যোম-বৈকুণ্ঠের নিত্য বিহারস্থল ক্রমে ক্রমে সকল ব্রহ্মাণ্ডেই উদিত ও অন্তর্হিত হয়ে থাকেন। এজন্য বেদ-পুরাণে লীলার নিত্যত্বই ঘোষিত হয়ে থাকে।



সেস্থলে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের 'মায়ার শরীর' (?) যদি তর্কের খাতিরে মায়ার ছলক্রমেও পরিত্যক্ত হতো, তবে গুণ্ডিচা-মন্দিরের এক নগণ্য কোণে নিশ্চয়ই তাঁর সমাধি হতো না। সম্রাট্ প্রতাপরুদ্র তাঁর সমস্ত বৈভবের বিনিময়েই সে-সমাধি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করতেন, যা দ্বিতীয় এক জগন্নাথ-মন্দিররূপেই দৃষ্ট হতো। সেস্থলে নিশ্চয়ই তা পরবর্ত্তি-কালের কিছু 'মুখোপাধ্যায়', 'চট্টোপাধ্যায়', 'সিংহ', 'ডি-লিট্' বাহাদুরদের প্রত্নতত্ত্ব-গবেষণার অপেক্ষায় পড়ে থাকতো না, কিংবা সেই সমাধিস্থান-নির্ণয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্যও ঘটতো না।

## শ্রীপুরীধাম এবং সমগ্র উড়িষ্যা-রাজ্যে অমলিন শ্রীচৈতন্য-প্রভাব

শ্রীপুরুষোত্তম-ধামসহ সমগ্র উৎকলরাজ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা প্রাচীনকাল হতে অদ্যাপি চলে আসছে। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ মন্দির-চত্বরেই ভক্তনয়নাভিরাম বিশাল ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি, মুণ্ডিত-মস্তকে উপবিষ্ট 'গুপ্তগৌরাঙ্গ' বিগ্রহ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণচিহ্ন প্রভৃতি পাণ্ডাগণের দ্বারা আজ পর্য্যন্ত সেবিত হচ্ছেন। বলাবাহুল্য, রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় হতেই সেস্থানে সেই গৌরপূজার সূচনা। এছাড়াও মূল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বিরাট্ চত্বর এখনও মহাপ্রভুর নামে 'শ্রীচৈতন্য-মণ্ডপ'-নামে পরিচিত। কেবল তাই নয়—পুরীধামে 'গৌরবাট্সাহি' নামে সুপরিচিত সেই পল্লী ও পথসকল অদ্যাবধি গৌরস্মৃতি সংরক্ষণ করছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের মধ্যে আজও শ্রীপ্রতাপরুদ্র এবং তাঁর অধস্তনগণের দ্বারা সেবিত 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' ও 'শ্রীগৌর-গদাধর' শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান্ আছেন। শ্রীরাধাকান্ত মঠে (শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন তথা গম্ভীরায়) সংরক্ষিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত পাদুকাদি এবং সেস্থলে শ্রীগোপালগুরু-স্থাপিত 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' শ্রীবিগ্রহ, গঙ্গামাতা মঠে (সার্ব্বভৌম-ভবনে) অবস্থিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্থাপিত নৃত্যরত শ্রীগৌরমূর্ত্তি এখনও একইভাবে সম্পূজিত হচ্ছেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর হতে শ্রীধামে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত বিভিন্ন মঠে গৌর-নিত্যানন্দের প্রাচীন বিগ্রহ-সকলের সেবা আজও প্রাণবন্ত।

শ্রীপুরী-ধাম ছাড়াও উড়িষ্যার অন্তর্গত রণপুর, নয়াগড়, খণ্ডপাড়া, টিগিরীয়া, বড়াম্বা, আটগড়, নরসিংহপুর, ঢেংকানল, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলে রাজা প্রতাপরুদ্রের সময় থেকেই শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহনজীর মন্দিরের সাথে সাথে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দেরও বিশাল বিশাল মন্দির আজও উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল প্রভাব প্রমাণ করে। বস্তুতঃ উৎকলে খুব কম গ্রামই আছে, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই। 'Vaitarini' (Vol. XIP.1)-গ্রন্থে কোন এক ঐতিহাসিকের এই উক্তি থেকে উড়িষ্যাবাসিগণের প্রবল গৌরপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়—"Orissa was chaitanya And Chaitanya was Orissa. The king, the subjects, the high and the low all were mad after him." অর্থাৎ, উড়িষ্যা মানেই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্য মানেই উড়িষ্যা ছিল—রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁর জন্য পাগল ছিলেন। Kennedy সাহেব তাঁর "The Chaitanya Movement" (P.75) গ্রন্থে লিখেছেন,—"Orissa became such a stronghold of the Chaitanya faith that today the name of Gouranga is more commonly reverenced and worshipped among the masses in Orissa than in Bengal itself." অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে সমগ্র উড়িষ্যা রাজ্য শ্রীচৈতন্য-বিচারধারার এত শক্তিশালী আধারে পরিণত হয়েছিল যে, আজ শ্রীগৌরাঙ্গের নাম এবং বিগ্রহ খোদ বঙ্গদেশ অপেক্ষাও উড়িষ্যায় অধিক সর্ব্বসাধারণভাবে সম্মানিত ও সম্পূজিত হয়ে থাকেন।' বাংলা অপেক্ষাও উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রভাবের আধিক্যের কারণ এই যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে মহাপ্রভু তাঁর অধিকাংশ সময়ই (দীর্ঘ ১৮ বৎসর) তিনি পুরী তথা উড়িষ্যায় অতিবাহিত করেছেন—এবং সেই সময়েই তাঁর প্রেমপ্রদান এবং প্রেমাস্বাদন-ভূমিকা উভয়ই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েছিল। এই সকল সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলির দ্বারা সমগ্র উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের অতুলনীয় প্রভাব সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়।



এটী অত্যন্ত হাস্যকর যে শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণের হস্তে অত্যন্ত নিঘৃণ্য-রূপে 'গুমখুন' হওয়া এক ব্যক্তির মূর্ত্তি খোদ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির-চত্বরেই পাণ্ডাগণের দ্বারা পূজিত হচ্ছেন—কেবল তাই নয়, উড়িষ্যার প্রায় প্রতি গ্রামেই সপ্রেম সেবিত হচ্ছেন। এটীকে যদি কেবল একটী 'ভাবাবেগ মাত্র'রূপেও বলা হয়, তবে ঐরূপ এক 'গুমখুন' হওয়া ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রকার ভাবাবেগই বা কিরূপে সম্ভব হয়? আর, এই ভাবাবেগটীকে অন্য আর দশটী ভাবাবেগের মতো 'আলেয়া'র ন্যায় ক্ষণিক-রূপে দেখা যাচ্ছে না, বরং তা—অনশ্বর, অম্লান, শাশ্বত ও ক্রমবর্দ্ধমান। কারণ, এই বিশেষ ভাবাবেগটী—জীবাত্মার নিত্য মঙ্গলকর। 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ' শ্রীমূর্ত্তিরূপে কেবল আর বাংলা ও উড়িষ্যাতেই আবদ্ধ নন—সমগ্র বিশ্বেই তাঁদের অপতিত আধিপত্য বিস্তার ক'রে চলেছেন।

**''পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।**
**সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"** (চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২৬)

মহাপ্রভু এই কথা স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সেই কথা যে কিরূপ সত্য, তা বর্ত্তমানে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। তিনি জগতে যে দানের পসরা খুলেছেন, তা ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ প্রার্থনা করেন।

জগতে তো অনেক অনেক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় অনেক অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেবল ইতিহাসের ঐরূপ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের অন্যতম নন। তিনি শ্রীমূর্ত্তি-রূপে সমগ্র জগতে সদা-সর্ব্বদা পূজিত হচ্ছেন। তিনি কেবল ইতিহাস মাত্র নন—তিনি 'শ্রীনাম' ও 'শ্রীমূর্ত্তি'-রূপে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁর অবদানের কথা যাঁরা সুস্থ চিত্তে আলোচনা করতে পারেন, তাঁরাই তাঁর মহত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন ক'রে অবনত-মস্তক হন।

# পঞ্চম-প্রসঙ্গ
# শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান

## ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব

**"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।**
**মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"** (গীঃ৭।২৫)

ভগবানের রূপ ও গুণ নিত্য, তথাপি তিনি সকলের নিকট প্রকাশিত হন না। তিনি তাঁর নিজ 'যোগমায়া'-শক্তির দ্বারা নিজকে আবৃত রেখে বিমুখ জীবের নিকট থেকে গুপ্ত রাখেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিত্যই প্রকাশিত তত্ত্ব—তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ব'লে কিছুই নেই। কেবল যোগমায়া-রূপ আবরণ-জালকে তিনি যখন স্বেচ্ছায় সংকোচ করেন, তখন তাঁর আবির্ভাব বা প্রকাশ ঘটে ও যখন সেই আবরণ-জালকে তিনি বিস্তার করেন, তখন তাঁর তিরোভাব বা অন্তর্দ্ধান ঘটে—এইভাবেই তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা সংঘটিত হয়ে থাকে—মূঢ়গণ তা জানতে পারে না। 'ছান্দোগ্য' উপনিষদে (৭।২৬।১) পরব্রহ্মের 'আবির্ভাব' ও 'তিরোভাব'-শক্তি নামক দুইটী শক্তির কথা দেখতে পাওয়া যায়। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ তাঁর সেই 'আবির্ভাব'-শক্তি-দ্বারাই তিনি জগতে প্রকট হন; সে-বিষয়টী ভগবান্ নিজ মুখেই প্রকাশ করেছেন—**"সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"**(গীঃ ৪।৬) এবং পরম স্বতন্ত্র সেই ভগবান্ পুনরায় তাঁর অধীন 'তিরোভাব-শক্তি'র দ্বারাই অন্তর্দ্ধান-লীলা ঘটিয়ে থাকেন। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাবর্ণনে সেই শক্তি ২টীর কথাই বারম্বার উল্লেখ করা হয়েছে,—

**"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।**
**'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥"**

নাটকের যবনিকা পতনদ্বারা যেমন দর্শকেরই চক্ষু আচ্ছাদিত হয় মাত্র—তাতে দৃশ্য বস্তু প্রকৃতপক্ষে লুপ্ত হয়ে যায় না, তেমনই ভগবান্ তাঁর



'তিরোভাব'-শক্তির দ্বারা অন্তর্হিত হয়েও তিনি নিত্য অবস্থিতই থাকেন। এইজন্য ভগবানকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে অভিহিত করা হয়। 'অধোক্ষজ'-অর্থে যিনি আমাদের সমগ্র ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে অনায়াসে তুচ্ছীকৃত করে থাকেন—"Godhead is He, who has reserved the right of not being exposed to the senses." তিনি সকলের সম্মুখে উপস্থিত থেকেও সকলের কাছেই অদৃশ্য থাকতে পারেন—আবার সকলের মধ্যেই বিশেষ কারও কাছেই মাত্র গোচরীভূত হয়ে অন্যান্যের কাছে রীতিমত অনুপলব্ধ হয়ে থাকতে পারেন। এইজন্য বৈষ্ণব-মহাজন 'শ্রীচণ্ডীদাসে'র পদাবলী-মধ্যে এক বিশেষ পদ দেখতে পাওয়া যায়,—

**"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে-জন, কেহ না দেখয়ে তাঁরে।**
**প্রেমের পীরিতি, যে জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥"**

শ্রীভগবান্—'অবাঙ্মানসগোচর', অর্থাৎ জীবের বাক্য বা মনের অতীত বস্তু। কিন্তু সেই ভগবানের জন্য যখন জীব-হৃদয়ে প্রবল 'প্রেম' লালিত হয়, তখন সেই ভগবানই জীবের ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত হন, এবং তখন—

**"কৃপা করি' মায়াজাল উঠায় যখন।**
**আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন॥"** (নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁর প্রকটলীলা-কালেই বেশ কয়েকবার এই প্রকারই আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যেমন—দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সময় তিনি কূর্ম্মাচলে কূর্ম্ম-নামে এক বিপ্রের প্রেমে আবদ্ধ হয়ে তাঁর স্থানে রাত্রিবাস ক'রে পরদিন প্রাতে তিনি পুনরায় যাত্রা করলেন, ওদিকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত 'বাসুদেব বিপ্র' নামে এক পরম বিষ্ণুভক্ত মহাপ্রভুর দর্শন-লালসায় সেইস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সেই কূর্ম্ম-বিপ্রের মুখে মহাপ্রভু চলে গিয়েছেন শুনে শিরে করাঘাত করতে করতে বাসুদেব হৃদয়বিদারী বিলাপ করতে লাগলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁর ক্রন্দনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে **আবির্ভূত** হলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন-সুখ প্রদানের দ্বারা কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত ক'রে কৃষ্ণভজনের উপদেশ করলেন।—

**"এতেক কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধানে।**
**দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥"** (চৈঃ চঃ ২।৭।১৪৯)

পুনরায় যেমন—সেই পাষণ্ডী বৌদ্ধাচার্য্য (এই গ্রন্থে ৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) মহাপ্রভুকে বিষ-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করাতে চাইলে প্রতিফল-স্বরূপে সেই থালির আঘাতে যখন মূর্চ্ছিত হন, তখন সেই বৌদ্ধাচার্য্যের সঙ্গীগণ প্রতিকারের প্রার্থনায় মহাপ্রভুর শরণাগত হলেন। তিনি তাঁদেরকে তখন নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করলেন। সঙ্গীগণ সেইভাবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে রত হলে বৌদ্ধাচার্য্য অবশেষে 'চৈতন্য' লাভ করলেন; মহাপ্রভুর প্রতি তাঁর 'স্বয়ং কৃষ্ণ'-জ্ঞান উদিত হলো এবং অতি বিনম্রভাবে তাঁকে স্তুতি করতে লাগলেন,—

**"কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।**
**দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়॥**
**এইরূপ কৌতুক করি' শচীর নন্দন।**
**অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন॥"**

(চৈঃ চঃ ২।৯।৬২-৬৩)

বস্তুতঃ এইপ্রকার অন্তর্দ্ধান ভগবানের জন্য কোন ঘটনাই নয়—কেবল দর্শকের সম্মুখে তাঁর নিজ যোগমায়া-দ্বারা যবনিকার পতন (Drop Scene) মাত্র ঘটে। বদ্ধজীব আমাদের কাছে যে ভগবান্ অদৃশ্য থাকেন, সেটীও তাঁর একপ্রকার অন্তর্হিত অবস্থাই। জীবের হৃদয়-পুষ্পে প্রেমমধু উদয় হলে প্রেমবশ্য শ্রীমধুসূদন সেই অন্তর্হিত অবস্থা থেকে উদিত হয়ে জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয় একচ্ছত্রভাবে অধিকার করে নেন—আর তখনই সেই পুষ্প সার্থকতার সৌরভে মণ্ডিত হয়ে জগৎকে উন্মাদিত করতে থাকে। এইপ্রকারে যাঁদের জীবন-পুষ্প সার্থক হয়েছে, তাঁদের কাছে ভগবানের লীলা নিত্যই অনুভূত হয়। এইজন্যই বলা হয়—

**"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর-রায়।**
**কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"**



ভগবান্ তাঁর লীলা সঙ্গোপন করলে অভক্ত-কুলের কাছেই কেবল তা কালাধীন কোন একটী 'ইতিহাস' অথবা 'Myth' বলে মনে হয়—কিন্তু ভক্তগণের কাছে ভগবৎলীলা কালাতীত নিত্য ঘটনা রূপেই অনুভূত হতে থাকে। বিভিন্নভাবেই ভগবান্ সেই বিরহ-কাতর ভক্তগণকে কখনও সাক্ষাৎ দর্শনদান করেন, কখনও নিজ-অঙ্গের পদ্মগন্ধ ভক্তগণের নাসাগত ক'রে, কখনও তাঁর চরণের নুপূরধ্বনি, সুমধুর কণ্ঠস্বর কর্ণপথগত করিয়ে, কখনও বা নিজ অঙ্গুলিপল্লবের রোমাঞ্চকর স্পর্শপ্রদান ক'রে, আবার কখনও তাঁর সাক্ষাৎ অধরামৃতের আস্বাদন রসনাগত করিয়ে—প্রভৃতির মাধ্যমে সেই ভক্তগণের কাছে নিত্য নিত্যই অনুভূত হতে থাকেন। আবার কখনও বা তিনি স্বপ্নযোগেই ভক্তগণের নিকট এসে নানা ভূষণ প্রভৃতি দান করেন, যা পরে জাগ্রত অবস্থাতেও দর্শন করে সেই ভক্তগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আগমন বুঝতে পারেন।

এইপ্রকারে যাঁদের কাছে নিত্যই ভগবানের স্ফূর্ত্তি ঘটে থাকে, সেই মহাভাগবত-গণের কাছে স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গের আদর থাকে না। তাঁরা ভগবান্ ও তাঁর লীলাসমূহকে প্রাচীন কোন ইতিহাস-রূপে মনে করতেই পারেন না। তাঁরা বাস্তবেই অনুভব করেন—তাঁদের সেই প্রাণনাথ নিত্য। তাই তাঁদের দ্বারা ভগবানের বিভিন্ন লীলা আলোচনাকালে তাঁর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ অনেকক্ষেত্রেই উল্লিখিত হতে দেখা যায় না।

সাধারণ মানুষ, অভক্ত-গণ ও ভক্তদ্বেষি-গণ সেই প্রেমিভক্ত-গণের হৃদয়ের এই বিশেষ অনুভূতির সামান্যতম আভাসও পান না—বরং নানাভাবে তখন তাঁরা কল্পনার কসরত আরম্ভ করেন। তাঁরা বুঝতেই চান না—ভগবৎ-চর্চ্চা কোন গবেষণাগারে, কিংবা লাইব্রেরীর অপ্রামাণিক সব গ্রন্থ-আলোচনার দ্বারা অথবা কেবল সময়ক্ষেপণ-কর আড্ডাখানায় হয় না—ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই মাত্র তা হয়ে থাকে। চিকিৎসকের কাছেই ত' চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষণীয়। সেটী কি আর ক্রীড়া-শিক্ষকের কাছে সম্ভব? পেঁচকের কাছে কি কখনও সূর্য্যের খবর পাওয়া যায়?

## মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের সূচনা

''গৌর-আনা-ঠাকুর'' নামে সুপরিচিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুর থেকে মহাপ্রভুকে লীলাসঙ্গোপন করবার সঙ্কেত পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দের দ্বারা এক তর্জ্জা প্রহেলীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন।✶—

**''বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল।**
**বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল॥**
**বাউলকে কহিহ—কাজে নাহিক আউল।**
**বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল॥''**

(চৈঃ চঃ ৩।১৯।২০-২১)

'মহাপ্রভুকে জানিয়ে দিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে; প্রেমের সেই হাটে চাল বিক্রয়ের স্থল নেই; প্রেমে ব্যাকুলচিত্ত হয়ে কুটুম্ব-পোষণের কার্য্যে তাদের আর সেই মন নেই। মহাপ্রভুকে বলে দিও যে প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতই এই কথা বলেছে।' তর্জ্জার সেই গম্ভীর তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জগদানন্দ কোনপ্রকার ধারণা করতে না পেরে তিনি পুরীতে এসে মহাপ্রভুর নিকট তা অবিকল জানালেন। শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন—''**তাঁর যেই আজ্ঞা**'' (চৈঃ চঃ ৩।১৯।২৩)। এদিকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ জন শ্রীস্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর এই কথা শ্রবণ-মাত্রই তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে কম্পিত-হৃদয়

✶শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত 'শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্'-এ এইপ্রকার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-কর্ত্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্রকে আকর্ষণ এবং তাঁকে অন্তর্দ্ধানের ইঙ্গিত-দান বর্ণিত হয়েছে—

**যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈ-, রাকৃষ্টঃ সন্ গৌর-গোলোকনাথঃ।**
**আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে, শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥''**
(প্রেমসিন্ধু-গর্ভজাত হুঙ্কারে যাঁহার। আকর্ষিত হয়ে গৌর গোলোক-ঈশ্বর॥
নবদ্বীপে অবতরে লয়ে পরিজন। সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যে লইয়ে শরণ॥)

**শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তি-প্রপূর্ণো, যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্দধেঽপি।**
**দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং, শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥**
(সর্ব্বশক্তি-পরিপূর্ণ শ্রীচৈতন্যধাম। তথাপি আজ্ঞায় যাঁর করে অন্তর্দ্ধান॥
রহস্য যাঁহার সকল করুণা-কার্য্য। শরণীয় মোর সেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য॥)



হলেন। ভাবী বিরহের আশঙ্কায় সেই বিষয়ে তথাপি দৃঢ় হওয়ার জন্য অস্ফুট-স্বরে তিনি মহাপ্রভুকে বললেন,—'**এই তর্জ্জার অর্থ বুঝিতে নারিল।**' উত্তরে মহাপ্রভু বললেন,—

প্রভু কহেন,—'**আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।**
**আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥**
**উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।**
**পূজা লাগি' কতকাল করেন নিরোধন।**
**পূজা-নির্ব্বহন হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন॥**'

(চৈঃ চঃ ৩।১৯।২৫-২৭)

অর্থাৎ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে পারদর্শী; তদনুসারে তিনি গঙ্গাজল ও তুলসীদ্বারা 'আবাহন' ক'রে মহাপ্রভুকে এই জগতে প্রকট করিয়েছেন। তাঁর দ্বারা পূজিত হয়ে তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করতে মহাপ্রভু জগতে ব্রহ্ম-শিবাদিরও দুর্ল্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে সকলকে বিতরণ করেছেন। অতঃপর আগম-শাস্ত্রের বিধি-অনুসারেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সেই 'তর্জ্জা'র ছলে 'বিসর্জ্জন'-মন্ত্র ব্যক্ত ক'রে জানালেন,—'হে প্রভো! যে উদ্দেশ্যে আমি আপনাকে ভূলোকে আবির্ভূত করিয়েছিলাম, সে উদ্দেশ্য আমার সম্পূর্ণ হয়েছে। জগৎ কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছে। অতএব আপনার অবতরণের জন্য আমার যে দায়বদ্ধতা ছিল, তা এক্ষণে সমাপ্ত হল—অর্থাৎ আপনার নিত্য শ্রীগোলোক-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন সুতরাং এখন হতে পারে।' তর্জ্জার সেই বিশেষ তাৎপর্য্য অনুধাবন করেই মহাপ্রভু '**তাঁর যেই আজ্ঞা**'—এই বলে তিনি তাঁর লীলা-সঙ্গোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

একইপ্রকার, ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার-হরণ করতে আসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও ব্রহ্মা স্বয়ং এসে তাঁর ভূভার-হরণ সম্পন্ন হয়েছে জানিয়ে তাঁকে লীলা-সঙ্গোপন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আগম শাস্ত্রের বিধি-অনুযায়ী এটীই শিষ্টাচার যে, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁর বিশেষ

আবেদনে যখন কাহারও আগমন হয়, তখন 'তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে'—এই সংবাদ তিনি স্বয়ং না জানালে প্রত্যাবর্ত্তন করা নিতান্তই অসৌজন্য-মূলক হয়। সর্ব্বমর্য্যাদা-স্থাপক শ্রীভগবান্ সর্ব্বস্বতন্ত্র হলেও তা কখনও লঙ্ঘন করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও এইপ্রকারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দ্বারা 'আবাহন' ও 'বিসর্জ্জন' সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এটিই শাস্ত্র-বিধান। সর্ব্বজ্ঞ-অভিমানী অজ্ঞ গবেষকের দল এইসব না জেনেই গুরু-বিষয়ে লঘু মন্তব্য করার ধৃষ্টতা প্রকাশ করেন।

## দিব্যোন্মাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'গোপীনাথে' প্রবেশ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেই তর্জ্জা লাভের পর হতেই মহাপ্রভুর এক অন্য দশা এসে উপস্থিত হল—শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত 'বিপ্রলম্ভ'-ভাব তখন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণিত হয়ে উঠলো। শ্রীরাধিকার ভাবাবেশে প্রতিক্ষণে তা বর্দ্ধিত হতে লাগল।

**''সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।**
**কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥**
**'উন্মাদ', 'প্রলাপ', চেষ্টা করে রাত্রিদিনে।**
**রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥'**

(চৈঃ চঃ ৩।১৯।৩০-৩১)

ভক্তগণ সেই পরম অদ্ভুত দশা দর্শন করে 'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হবেন'—এইপ্রকার বিচার তাঁরা পরস্পর করতে লাগলেন। ওদিকে মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সাথে নিরন্তর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীত-গোবিন্দ, কৃষ্ণকর্ণামৃত ও জগন্নাথবল্লভ-নাটক থেকে ব্রজভাবোদ্দীপক বিভিন্ন শ্লোক পাঠ করে দিনরাত্রি 'দিব্যোন্মাদ'-দশায় বিভোর হয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধার যে-প্রকার 'উদঘূর্ণা'-দশা লাভ হত, মহাপ্রভুও সেইপ্রকার অপ্রাকৃত প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ-ঈর্ষা-দৈন্য-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-আর্ত্তিতে অনুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে থাকতেন। পরম গম্ভীর সেই



'মহাভাব'-মহাসিন্ধুর গর্ভ হতে মর্ম্মভেদী বিরহ-ব্যাকুল-বিলাপের তরঙ্গরাশি উত্থিত হয়ে গম্ভীরা-মধ্যে একের পর এক ভেঙ্গে পড়তে লাগল।—

''সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন॥'' (চৈঃ চঃ)

এইপ্রকার রাধাভাবাবেশে প্রিয়তমের সাথে মিলনের সুতীব্র লালসায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু একদিন টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। এই সেই 'গোপীনাথ'—শ্রীমন্মহাপ্রভু একসময় মহাভাবে বিভোর হয়ে হৃদয়-প্রোথিত যে শ্রীমূর্ত্তিকে 'যমেশ্বর'-শিবের পুষ্পবাগিচায় বালুকারেণু অপসারণ ক'রে উত্তোলন করেছিলেন এবং অশ্রুপ্রবাহে অভিষিক্ত ক'রে যাঁকে তাঁরই নিজশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কাছে সমর্পণ ক'রে পরম নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। প্রাণপ্রিয় সেই শ্রীগদাধরকে মহাপ্রভু অত্যন্ত গোপনে তাঁর সে-অন্তিম অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে চিরসাথী গদাধর এইপ্রকারেই ছিলেন তাঁর সেই গুপ্ত অভিলাষের শ্রোতা—ছিলেন বাষ্পাকুল লোচনে সন্ন্যাস-গ্রহণের নীরব সাক্ষী—ছিলেন সেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-দেবের নীলাচল যাত্রা-পথের অতন্দ্র সঙ্গী। কিন্তু আজ তাঁর ঐ মহামিলনে সহযাত্রী হবার নির্দ্দেশ লাভ না ক'রে গদাধর গৌর-বিরহে বুক ভাসাতে লাগলেন। দুর্ঘট-ঘটন-বিধাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার ক'রে গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলেন—গৌর-বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিগ্রহে প্রবিষ্ট হলেন।

**''তত্ত্বমেকং পরং বিদ্যাল্লীলয়া তদ্দ্বিধা স্থিতম্।**
**গৌরঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং হ্যেতদুভাবুভয়মাপ্লুতঃ॥''** ✶

সেই এক পরাৎপর-তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরচন্দ্র—এই দুইরূপে অবস্থান। বিপ্রলম্ভ-লীলাস্বাদন-মানসে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবিগ্রহে সঙ্কীর্ত্তন-বিলাস এবং কৃষ্ণচিন্তা-নিবেশে শ্রীগৌরের কৃষ্ণবিগ্রহত্ব প্রাপ্তি—এইভাবে উভয়েই

✶ ''শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-তত্ত্বাষ্টকম্''—পরমহংস শ্রীশ্রীল-ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজেন-বিরচিতম্।

উভয়তা প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধার যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ, সেইরূপ গদাধরের শ্রীগৌর। তাই তিনি নিজেকে 'গদাধর-প্রাণনাথ' প্রমাণ করতেই শ্রীগদাধরের নিত্যসেবিত গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের সেই দ্বারদেশ পুনঃ আর সেই শ্রীগৌরচরণ-স্পর্শে ধন্য হতে পারেনি।

এইপ্রকারে শ্রীমামু-গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কিছু পরে পুরীধামে আগত শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের কাছে তাঁর সেই সাক্ষাৎ দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। শচীমায়ের সহোদর ভ্রাতা শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীই মহাপ্রভুর মামা সম্পর্কে সকলের নিকট 'মামু-গোস্বামী' নামে পরিচিত ছিলেন। গদাধর শাখান্তর্গত সেই শ্রীমামুগোস্বামী ছিলেন শ্রীগোপীনাথের পরবর্ত্তী সেবক। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরাগত শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাপ্রভুর এই বিশেষ প্রসঙ্গটী 'ভক্তিরত্নাকর' (৮।৩৫৪-৩৫৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"**ওহে নরোত্তম! এইখানে গৌরহরি।**
**না জানি—কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥**
**দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।**
**তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ-হৃদয়॥**
**ন্যাসি-শিরোমণি-চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার?**
**অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥**
**প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।**
**হৈলা অদর্শন—পুনঃ না আইলা বাহিরে॥**"

## শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-কাল

মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান-কাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এইরূপে উল্লিখিত আছে—

"**চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।**
**চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈল অন্তর্দ্ধান॥**" (চৈঃ চঃ ১।১৩।৯)

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪৫৫ শকাব্দে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন,—কিন্তু তাতে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের মাস-



সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। শ্রীমন্নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে তা কথঞ্চিৎ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে 'তৃতীয় তরঙ্গে' দেখা যায়—শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিজ বাসস্থান যাজিগ্রাম হতে মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে নীলাচল উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।—

"**মাঘ শুক্লা-পঞ্চমী-দিবসে শুভক্ষণ।**
**মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন॥**"

পথে নীলাচল হতে গৃহে ফিরে যেতে থাকা যাত্রিগণের মুখে তিনি মহাপ্রভুর কথা শ্রবণ করতে করতে তাঁর দর্শন-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো; তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে দিবানিশি চলতে লাগলেন। মনে মনে তিনি মহাপ্রভুর কাছে উড়ে যাবার জন্য শ্রীগরুড়ের মতো পাখা প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই দারুণ আনন্দোৎকণ্ঠার মধ্যে যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে সর্ব্বাধিক দুঃখময় সংবাদ অকস্মাৎ কর্ণগোচর হ'ল—যা তাঁর গৌরপ্রেম-পরিপূর্ণ-হৃদয়খানি একেবারে ভেঙ্গে দিল।

"**মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।**
**কতদূরে শুনিল চৈতন্য-সঙ্গোপন॥**"

এস্থলে দেখা যায়, শ্রীনিবাসাচার্য্যের নীলাচল-যাত্রাপথের মধ্যকালে কোন দিবসে মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-লীলা সঙ্ঘটিত হয়। গৌড়দেশ হতে ভক্তগণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় নর্ত্তন-কীর্ত্তন-বিশ্রাম প্রভৃতি করতে করতে প্রায় ২০ দিনে নীলাচলে পৌঁছাতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ১২ দিনে নীলাচল-ধামে পৌঁছিয়েছিলেন—এসব কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে দেখা যায়। সুতরাং 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থের বর্ণনা-দ্বারা নির্ণয় হয় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর পরে খুব বেশী হলেও ২০ দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। কারণ শ্রীআচার্য্য প্রভু মাঘী শুক্লা-পঞ্চমীতে গৌড়দেশ হতে যাত্রা করে নীলাচলের ২০ দিনের পথের চলাকালে মহাপ্রভুর অপ্রকট-সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন। অতএব বলা যেতে পারে যে—শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকাব্দে মাঘ মাসে অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করেছিলেন।

## মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে আরও দুটী বিচার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গে এছাড়া আরও দুইটী বিচার কোন প্রামাণিক গ্রন্থে না থাকায় কেবল কিংবদন্তিরূপেই চালু আছে। তার মধ্যে একটী হল—মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহে লীন হওয়া এবং অপরটী—তাঁর সমুদ্রে প্রবেশ। সর্ব্বমোট এই তিনটী বিচার একই সাথে জনসমাজে প্রচলিত থাকায় ক্ষুদ্র-মস্তিষ্কের যুক্তিবাদীরা এই সকলেরই সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। আমরা কিন্তু ঐ তিনটী বিচারের কোনটীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হতে পারি না। কারণ, অচিন্ত্য ক্ষমতাময় শ্রীভগবানের পক্ষে তা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। 'সর্ব্বশক্তিমত্তা'—ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা বলতে যদি মানববুদ্ধিতে যা ধারণা-যোগ্য অথবা মানবের পক্ষে যা সম্ভব, কেবল তাই হতে হয়, তাহলে সেটীকে নিশ্চয়ই সর্ব্বশক্তিমত্তা বলা যায় না। মানব-মেধায় যা অঘটনীয়, তাও ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির অধীন বলেই ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা। যেমন রথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

**"আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।**
**এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥**
**সবে কহে—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।**
**অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায়॥**
**পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে।**
**অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে॥"**

(চৈঃ চঃ ২।১৩।৫২, ৫৩, ৬৬)

কেবল তাই নয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎরূপে নীলাচলে বিরাজিত থাকলেও তাঁর 'প্রেম-পরতন্ত্র'-স্বভাববশে তিনি একই সাথে শচীমাতার বাৎসল্যঘন সেবামণ্ডিত মন্দিরে, নিত্য গৌরপ্রেমাবিষ্ট শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নর্ত্তন-স্থলীতে, শ্রীবাস পণ্ডিতের সংকীর্ত্তন-স্থলীতে এবং শ্রীরাঘব পণ্ডিত-দময়ন্তীর প্রেম-ঘনীভূত সেবালয়ে—এই চার স্থানে তিনি সদা আবির্ভূত হয়ে তাঁদের প্রেমসেবা গ্রহণ করতেন।—



**"এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাব।**
**এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥**
**শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।**
**শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥**
**এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।**
**প্রেমাকৃষ্ট হয়—প্রভুর সহজ স্বভাব॥"**

(চৈঃ চঃ ৩।২।৩৩-৩৫)

সুতরাং এইপ্রকার অচিন্ত্যপ্রভাবময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-বিষয়ে সেই দুইটী জনশ্রুতিকেও অস্বীকার করা যায় না। বরং বলা যায়—শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধানকালে তিনি নীলাচলে বিভিন্নস্থানে অবস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট তাঁর অন্তর্দ্ধান অবহিত করাতে তিনি একই সাথে সেই তিনপ্রকারে অন্তর্দ্ধান-লীলার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন—অচিন্ত্যশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে তা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। "**অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।**" (মহাভারত)—অচিন্ত্যভাবের বিষয়ে তর্কের যোজনা করা উচিত নয়। মানবমেধায় সব কিছুরই রহস্য উন্মোচন সম্ভব হয় না। সেই সব স্থানে অযথা তর্কের যোজনা ক'রে অতঃপর তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে কিংবা নিজের মনোমত বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা প্রদানের দ্বারা হয়ত' আত্মতুষ্টি লাভ হতে পারে, কিন্তু এতে কেবল আত্মবঞ্চনা এবং পরবঞ্চনাই সার হয়।

সুতরাং পাঠকবর্গ! অনুমান, কল্পনা বা মনোধর্ম্ম-পর ব্যক্তিদের অপরাধময় চিন্তাস্রোতে রচিত অপ্রামাণিক জাল-পুস্তকাদির অসৎসিদ্ধান্ত কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। সৎসিদ্ধান্তপর ব্যক্তিমাত্রই কুবুদ্ধি-পর প্রাকৃত গবেষকদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতামতের প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে বরং প্রমাণ-শিরোমণি শ্রুতির সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য করেন।—

**"এই সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।**
**আবির্ভাব, তিরোভাব—এই কহে বেদ॥"**

## ভগবানের ভগবত্তা-অনুভবেই মানবের বিমুক্তি

কথায় আছে,—"Call spade a spade" অর্থাৎ যেটী যা, তাকে তা-ই বলতে হয়। 'আম'কে কেউ 'জাম' বললে বুঝতে হয় যে, তার আম কিংবা জাম, কোনটী সম্বন্ধেই জ্ঞান নেই। ভগবান্‌কে এইপ্রকারে মানব বা কোন মানবকে ভগবান্ ব'লে কেউ গৌরবানুভব করতে চাইলে তার বস্তুজ্ঞানের অভাবটীই প্রকট হয়ে উঠে। পিতা যেমন পুত্রের সৃষ্ট বা কল্পিত কিছু হতে পারে না, তেমনই ভগবান্ কোন মানবসৃষ্ট ব্যাপার নয়। ভগবানের নিশ্বাস-জাত বেদ-পুরাণ-ইতিহাসই প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সমস্ত জ্ঞানের আকর। তার দ্বারাই মাত্র ভগবানের ভগবত্তা মানব-জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। কোন "Apotheosis"-এর আশ্রয়ে কিংবা গণমতের ভোটে শ্রীচৈতন্যদেবে ভগবত্তা আরোপ করা হয়নি। কিন্তু অকালকুষ্মাণ্ড ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষার দম্ভে স্বয়ংস্ফীত গবেষকদের শ্রীভগবানের ভগবত্তায় মানবতা অনুসন্ধানের যে প্রবণতা, তা সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু-অনুসন্ধানের মতই নিরেট মূর্খতা। নিজের রূপ-অনুসারে রূপদানের ইচ্ছা থেকেই যে মানব-রূপের সৃষ্টি, সেই ক্ষুদ্র মানবতার দৃষ্টিতেই ভগবদ্দর্শন করতে চাওয়া কি-প্রকার হাস্যকর! '**দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ**'—দৈবভাব-অবলম্বনেই দেব-দর্শন হয়। এইপ্রকারেই ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের দিব্যত্ব সর্ব্ব দৈবী-ভাবাপন্ন মানবের অনুভব হয়।

**"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।**
**ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"** (গীঃ ৪।৯)

ভগবানের যে দিব্যত্ব, তা গড়-মানুষের ধারণার কোন স্বর্গীয় ভাব নয়। 'দিব' ধাতুর অর্থ 'ক্রীড়া' ও 'ইচ্ছা'পর—শ্রীভগবানের দিব্যজন্ম, দিব্যকর্ম্ম, কোন কর্ম্মফল-বাধ্য না হয়ে সম্পূর্ণ নিজ ক্রীড়া ও ইচ্ছা-বশেই সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্রীড়ায় যে-প্রকার নিজের ও অপরের আনন্দেরই উদ্দেশ্য থাকে, সে-প্রকার ক্রীড়া ও ইচ্ছা-প্রসূত ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম সকলই সুধী মানবের নিত্য আনন্দের কারণ। তাই ত' তিনি মূল 'কামদেব'—সর্ব্ব ইচ্ছার দেবতা—সর্ব্ব আনন্দের অধিষ্ঠাতা। অণুচৈতন্য মানব যখন



নিজ হৃদয়ে সর্ব্বচৈতন্যের মূল সেই স্বরাট্ ভগবানের পরমদিব্যত্ব, স্বতন্ত্র পদচারণার চমৎকারিতা অনুভব করেন, তখন তাঁর পঞ্চভূতের ফাঁদ, এমনকি ২৪ মহৎ-তত্ত্বের পাশ ছিন্ন হয়ে তিনি ভগবানের সেই স্বতঃ আনন্দালোকে উদ্ভাসিত স্বরাজ্যে বসবাসের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। আর তার পরিবর্ত্তে হায়! কোথায় শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্মের অলৌকিকতা অস্বীকার করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বরং মানবধর্ম্মের তুলাদণ্ডে তাঁকে মেপে নেওয়ার জঘন্যতম গবেষণা! ভগবত্তাকে কোন মানবতায় পর্য্যবসিত করার অর্থ হল—অনাদি-কাল হতে চলতে থাকা নিজের ও অপর সকলের জন্ম-মৃতুর চক্রকে অব্যাহত রাখা।

পেঁচাদের অভিশাপে সূর্য্যোদয় কখনও স্তব্ধ হয়ে যায় না। সুকৃতিসম্পন্ন মানবগণের চৈতন্যোদয় কতকগুলি পাষণ্ডদের চীৎকারে বন্ধ হয়ে থাকে না। ত্রিতাপগ্রস্ত বিবেকী জীব নিজের প্রাণের তাগিদেই শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে সাড়া দিবেনই। কারণ, অচৈতন্যের সাথে চৈতন্যের সহবাস কখনই আনন্দপ্রদ হয় না। সৎসঙ্গেই চৈতন্য-সংবাদ অজ্ঞান-জীবের জ্ঞানগোচর হয়। আলোচ্য প্রসঙ্গ-সমূহের সঙ্গসান্নিধ্যে সাধারণ জনমানসে সর্ব্বকল্যাণ-খনি শ্রীচৈতন্য-দেবের সম্বন্ধে পাষণ্ডদের সৃষ্ট বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটবে, সন্দেহ নেই। গবেষকগণ সুস্থচিত্ত হয়ে এরপর তাদের নিজ নিজ অধিকার-গণ্ডী অতিক্রম-পূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধাচরণ-মূলে যে-সব অনুসন্ধিৎসা, তা বন্ধ করবেন—এই প্রত্যাশা। তাঁরা অযথা কেবল ভগবানের অন্তর্দ্ধান-বিষয়েই অত্যুৎসাহী না হয়ে বরং তাঁর আবির্ভাবের কারণ, তাঁর অবদান-বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করুন—তাতে নিজে এবং সমগ্র বিশ্ব উপকৃত হবেন।

# ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

## শ্রীচৈতন্য-ভাব বনাম অচৈতন্য-যুক্তি

**"বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি ন সংশয়ঃ।**
**বিশ্বং গৌররসে মগ্নং স্পর্শোঽপি মম নাভবৎ॥"**

আজ হতে কিঞ্চিৎ পাঁচশতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ ত্রিদণ্ডিযতিবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্"-গ্রন্থে নিজ দৈন্যোক্তির আবরণে বর্ত্তমানের কুযুক্তি-কূপে নিপতিত হতভাগাদের প্রতি ইঙ্গিত করেই এইপ্রকার খেদোক্তি প্রকাশ করেছিলেন,—'অহো! যুক্তিপর সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিশ্বের সুধীগণ যেস্থলে শ্রীগৌররস-সিন্ধুতে অবগাহন করছে, আর সেস্থলে তোমরা তোমাদের কুযুক্তির এঁদো পুকুরকেই সর্ব্বস্ব ভেবে কিনা সেই রসসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শ হতেও বঞ্চিত হয়েছ!' বরং সেই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধেই তোমরা যাবতীয় নিন্দা-থুৎকার ঊর্দ্ধে নিরন্তর নিক্ষেপ করছ! কিন্তু তা যে ফিরে তোমাদেরই নানা অনর্থের 'ছাৎলা-পড়া' চিত্তকে আরও ঘৃণিত ক'রে তুলছে, সেটীও তোমাদের অবুঝ মস্তিষ্কে ধরা পড়ছে না! শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পুতপদাঙ্ক-অনুসারিগণকে এক যুক্তিহীন 'ভাববাদী' বলয়ে মাত্র আবদ্ধ ব'লে যে তোমরা নিজেদের সেই অন্ধকূপৈকনিষ্ঠা প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করছ—তার এক কপর্দকও মূল্য নেই। চোখ খুলে দেখ—তোমাদের স্বপ্নের পাশ্চাত্য জগতের সেই আদর্শগণ ভোগবিলাসপর সব যুক্তি বস্তাবন্দী করে কিভাবে শ্রীচৈতন্য-চরণে আশ্রয় নিয়ে কৃতকৃতার্থ হচ্ছেন! যে ভারতবর্ষের অপার মাহাত্ম্য ও অফুরন্ত সম্পদকে অবজ্ঞা ক'রে কেবল জড়যুক্তির অনুসন্ধানে তোমরা পাশ্চাত্যমুখী হয়েছ, সেই পশ্চিমিগণ পারমার্থিক প্রযুক্তির প্রলোভনে কিভাবে সর্ব্বপ্রযুক্তির আকর সেই নদীয়াচন্দ্র শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণকে সর্ব্বস্ব করে নিয়েছেন। তথাপি তোমাদের চৈতন্যোদয় হচ্ছে না—তোমরা তোমাদের গোঁ ছাড়বে না। তাহলে এ সম্পর্কে ছোট্ট একটা গল্প বলি শুন—



পঞ্চানন নামে কোন এক গ্রাম্য বালক বেশ বড় হয়ে গেলেও উলঙ্গ হয়েই ঘুরতো। তাই 'ন্যাংটা পেঁচো' নামেই সে গ্রামে বিশেষ পরিচিত ছিল। কিন্তু লেখাপড়া ও স্বভাব-চরিত্রে ভাল সেই পঞ্চানন পরবর্ত্তিকালে সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বি-এল, ডি-এল পাশ ক'রে পঞ্চানন এখন উকিল। কিন্তু তার উন্নতিতে গাত্রদাহ হতে থাকা কিছু গ্রামবাসী থাকতে না পেরে আস্ফালন ক'রে উঠল—"আরে রেখে দে ঐ পেঁচোর কথা, নকল করে পরীক্ষায় পাশ করে আবার উকিল!" পঞ্চানন এখন রীতিমত বাবু, কয়েক বৎসরেই তাঁর জেলা-জজে পদোন্নতি হল। মাৎসর্য্যে অধীর হয়ে সেই গ্রামবাসীরা 'যত সব গাঁজাখুরী কথা' বলে তা উড়িয়ে দিল। কিন্তু কাগজে কলমে যখন পঞ্চানন বাবু জজ্-সাহেবের নাম দেখিয়ে দেওয়া হ'ল, তখন তারা বলে উঠল—"আরে ন্যাংটা পেঁচো জজ্ হলে কি হবে, নিশ্চয়ই বেতন পায় না।"

তোমাদের অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। সব দেখে শুনেও তোমাদের একই কথা—"ওদের কেবল ঐ ভাবই—যুক্তি নেই।" তাহলে বলি শুন—কেউই যুক্তি ছাড়া থাকতে পারে না। তোমরা যেমন ভগবান্‌কে মানার কোন যুক্তি পাও না; তেমনই সাধুগণও ভগবান্‌কে অস্বীকার করার কোন যুক্তিই খুঁজে পান না। চোর যেমন তাদের চৌর্য্যবৃত্তির পুষ্টিকারক যুক্তি আবিষ্কার ক'রে নেয়, তোমরাও তেমন 'ভগবান্ নেই' যুক্তি দেখিয়ে তাঁর সম্পদ্ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে পরস্পর 'মাসতুতো ভাই' হয়েছ। কিন্তু ভায়া! যতই ব'ল, সাধুর যুক্তি এবং অসাধুর যুক্তি, চক্ষুষ্মানের যুক্তি ও অন্ধের যুক্তি, বৃদ্ধের যুক্তি ও শিশুর যুক্তি, পণ্ডিতের যুক্তি ও মূর্খের যুক্তি কখনও এক হয় না। তাই বলে অসাধু যদি সাধুকে, অন্ধ চক্ষুষ্মানকে, শিশু বৃদ্ধকে, মূর্খ পণ্ডিতকে 'অযৌক্তিক' বলে ঘোষণা করে এবং 'ধ্বনি-ভোটে' যদি তা নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যও পায়, তবেও কি তা বাস্তব বিচারে যুক্তিগ্রাহ্য? যুক্তির মধ্যে যে তারতম্য থাকে, তা দুঃখের বিষয়, তোমাদের জানা নেই। যেস্থলে উচ্চতর যুক্তি (Higher Logic) বর্ত্তমান, সেস্থলে

নিম্নস্তরের যুক্তির (Lower Logic-এর) স্থান কোথায়? কেবল মূর্খদের মুখেই তখন তা শোভা পেতে থাকে। অন্ধের যুক্তি নেতিবাচক, আর চক্ষুষ্মানের যুক্তি ইতিবাচক—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? অবশ্যই দ্বিতীয়টি। আবার অল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের যুক্তি অপেক্ষা নিশ্চয়ই উঁচুমানের যুক্তি, যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে—একজন যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তি কি তা কখনও অস্বীকার করতে পারেন?

তোমাদের জড় চোখের দর্শন—কেবল এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পর্য্যন্ত। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের দর্শন—সেই দশটী ইন্দ্রিয়ের পরিচালক অন্তরিন্দ্রিয় মন অবধি। আর আত্মদর্শিগণ দেহ, মন এমনকি বুদ্ধিকেও অতিক্রম ক'রে আত্মবস্তুর দর্শন করেন। তাঁদের সেই দর্শনটী দেখ কত সুন্দরভাবে উপমা-সহকারে বর্ণিত হয়েছে—

"**আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।**
**বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥**
**ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥**" (কঠোপনিষৎ)

শরীর যদি রথতুল্য হয়, তবে আত্মা—রথারোহী, সেক্ষেত্রে বুদ্ধি হল—সারথি, মন—লাগাম, ইন্দ্রিয় সমস্ত—ঘোড়া এবং সমস্ত জড়বিষয়—সেই ঘোড়াগুলোর চারণক্ষেত্র। তাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে পরস্পর একটী বিশেষ ছন্দে সুসংবদ্ধ। সেই ছন্দপতন যখনই ঘটে, তখনই আমাদের শারীরিক, মানসিক যতপ্রকার ক্লেশ উদয় হতে থাকে। সুতরাং সেই আত্মবিদ্‌গণের প্রদর্শিত পথ ছাড়া এই ছন্দের সুসংহতি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাহলে দেখ, তাঁদের সেই দিব্যদর্শনের সাথে তোমাদের জড়দর্শনের তুলনা! আত্মতত্ত্ব, পরজগৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের সকল যুক্তিই নেতিবাচক—আর তাতেই তোমাদের অন্ধত্ব প্রমাণিত হয়। ছানি-পড়া চোখের কতটুকু কার্য্যকারিতা থাকে? আত্মদর্শন-ক্ষেত্রে তোমাদের চোখগুলোও ঠিক সেইপ্রকার—ছানি-পড়া চোখ। জড়চোখে সমস্ত দর্শনই তোমাদের জড়ীয়। জড়ত্বের জ্বরে তোমরা সবসময় জর্জ্জরিত হয়ে আছ। যাঁরা চক্ষুষ্মান্—



স্বচ্ছদৃষ্টি-বিশিষ্ট, সেই তাঁদের দর্শনে তোমরা বিশ্বাসী হতে পার না—ঘোলা চোখ নিয়ে সেই দূরদর্শী তাঁদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে বরং স্পর্দ্ধা কর এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে গুরু-বিষয়ে লঘু মন্তব্য ক'রে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা—উভয়ই আবাহন কর। "দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ।"

তোমাদের যে-সকল যুক্তি, তা সমস্তই অচৈতন্যপর। সর্ব্বক্ষম, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই মূল-চৈতন্য-বস্তুর স্বীকৃতি অপেক্ষা অচৈতন্যের ধারণাতেই তোমাদের যত আনন্দ। তোমাদের জীবন—এক রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলবিশেষ। সেস্থলে নিত্যচেতন বস্তুর নিত্য ভূমিকা-সম্বন্ধে তোমাদের কোনরকম জ্ঞানগম্যিও থাকার কথা নয়। মূলেই যাদের গলদ, ফলকালে তারা 'বলদ' বৈ আর কি? সমগ্র বিশ্বে তোমাদের অচৈতন্যবাদী তাবড় তাবড় তাবৎ বৈজ্ঞানিক, মনীষি, চিন্তাবিদ্‌দের 'বুদ্ধি' একত্রিত হয়েও যে চৈতন্য (Conciousness) নামক বস্তুটির হদিস্ তোমাদের পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না✶—সেই চৈতন্যের স্রষ্টা কিনা এক জড় রাসায়নিক ক্রিয়া!—

✶ "In my search for the secret of life. I ended up with atoms and electrons, which have no life at all. somewhere alone the line, life has run out through my fingers." — Albert Szent Gyorgyi in "Biology Today".

(—জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার গবেষণা শেষ পর্য্যন্ত কিছু অণু-পরমাণুতেই এসে উপনীত হল, যাদের কোন জীবন নেই। সেই গবেষণার কোনস্থানে যেন 'জীবন' আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়েছে।)

"We can admittedly find nothing in physics or chemistry that has even a remote bearing on consciousness. Yet all of us know that there is such a thing as consciousness, simply beacause we have it ourselves. Hence consciousness must be part of nature, or more generally, of reality".

—Niels Bohr, Noble Laureate, Physics.

(—আমরা অকপটতার সাথে দেখি যে, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানে কিছুই নেই, যাতে 'চৈতন্য'-বিষয়ে কোন দূর-ধারণাও সম্ভব হয়। অথচ আমরা সকলে জানি যে, 'চৈতন্য' বলে একটা ব্যাপার আছে—এই সাধারণ কারণে যে, আমাদের নিজেদেরই তা আছে। অতএব চৈতন্য অবশ্যই প্রকৃতির বা আরও বিস্তৃতভাবে, বাস্তবেরই একটা অংশ।)

চৈতন্যের পিতা কিনা এক অচৈতন্য! ধিক্ তোমাদের চৈতন্য! ধিক্‌তোমাদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা!! চেতনার কার্য্যসকল (Effects) দর্শন করে তাদেরকেই চেতনার কারণ (Cause) মনে ক'রে ভ্রমে পতিত হও। এইপ্রকার বুদ্ধিবিভ্রমে পতিত হয়ে দধি থেকে দুধের সৃষ্টি করতে চাওয়ার মতই তোমাদের এই চৈতন্য-বিশ্লেষণ। চৈতন্য যে কি বস্তু, কোথায় তার উৎপত্তি, কিভাবে তার গতাগতি সংঘটিত হয়, তা নিয়ে এই বৈদিক সনাতন-ধর্ম্মে যে সহস্র সহস্র উপনিষৎ, পঞ্চরাত্র, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা প্রভৃতির সম্ভার আছে, তার সহস্র ভাগের একভাগও অন্য কোন ধারায় বা ধারণায় নেই। অথচ এ সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে ভারতবাসী তোমরা যে অচৈতন্য-যুক্তির দিকেই ধাবিত হও, তাতে তোমাদের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করণীয় থাকে না।

'ভাব' ও 'যুক্তি'কে পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী বলেই তোমরা মনে কর। কিন্তু, ভায়া! তোমরা জান না যে, ভাবহীন যুক্তি নিছক শুষ্কযুক্তি। 'ভাব'—স্বরবর্ণের মতো—নিজের স্বর, নিজের বর্ণ, সকলই আছে। অপর-দিকে 'যুক্তি'—ব্যঞ্জনবর্ণ-তুল্য—নিজস্ব 'বর্ণ' আছে বটে, তবে স্বর নেই; স্বরবর্ণের স্বর এসে যুক্ত হলেই তা প্রাণবন্ত হয়। তাই যুক্তি মূলতঃ ভাবাধীন, অপরদিকে যুক্তিদ্বারা ভাবের ব্যাখ্যা প্রায়শঃই সম্ভব নয়; কারণ, যুক্তি সসীম, কিন্তু ভাব অসীম। চেতনধর্ম্মে এই 'ভাব' এবং 'যুক্তি'র সহাবস্থান অবধারিত—অনেকক্ষেত্রে একে অপরের সম্পূরক। 'Computer'-যন্ত্রে যুক্তির প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু ভাবের অভাব—তাই কখনও তা মানুষের সমকক্ষ নয়; নতুবা রোবট্ প্রভৃতির দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের অভাব পূরণ করা যেত।

সেই ভাবকে অস্বীকার ক'রে যাঁরা কেবল যুক্তিনির্ভর হন, সমাজে তাঁরা সেই নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ—সেই স্বর-হীন ব্যঞ্জনবর্ণের মতোই অপাংক্তেয়। কেবল যুক্তিবাদী কেউ যদি কোন 'দয়ার্দ্র-হৃদয়' ব্যক্তির হৃদয়ে সত্য সত্য দয়া আছে কিনা, তার চাক্ষুষ-প্রমাণের জন্য একেবারে হৃৎপিণ্ড-ব্যবচ্ছেদেই অগ্রসর হন, তবে তার মানসিক ভারসাম্য নিয়েই প্রশ্ন উঠ্‌বেই। দুঃখদায়ক



ভাবে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আনন্দকর ভাবে হৃদয় উল্লসিত হয়, ভয়জনক ভাবে হৃদয় কম্পিত হয়—এই সকলেরই বাহ্যিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং ভাবের অস্তিত্ব নিতান্তই অনস্বীকার্য্য।

মানুষ নিজের ভাব-অনুযায়ীই যুক্তি-অনুসন্ধানে যত্নশীল হয়। এই জন্যই একই পিতার ঔরসে ও একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেও, একই পরিবেশ ও একই শিক্ষায় লালিত-পালিত হয়েও অনেকক্ষেত্রেই পরস্পর যুক্তি-ভেদ দেখা যায়। কারণ, ভাবের কার্য্যরূপে আছে প্রবৃত্তি—যা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিনপ্রকার। সুতরাং প্রবৃত্তির ভেদে যুক্তি-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। আবার প্রবৃত্তির তারতম্য-অনুসারে যুক্তিরও তারতম্য স্বীকার্য্য—সব যুক্তির একই মূল্যায়ন নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ নয়। পুনরায়, যুক্তিদ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় বিচারটিও নিজ নিজ ভাব তথা প্রবৃত্তি-সাপেক্ষ ব্যাপার। সুপ্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি যথার্থ যুক্তিনিষ্ঠ—তিনি সুযুক্তিগ্রাহী ও কুযুক্তি পরিত্যাগী—তিনি 'নাই যুক্তি' অপেক্ষা 'আছে যুক্তি'রই প্রাধান্য অনুভব করেন—তিনি উভয় যুক্তিকেই সমান বলেন না, বা উভয়কেই অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করেন না। সুতরাং যথার্থ যুক্তিনিষ্ঠের সাথে যুক্তিগত বিরোধ উৎপন্ন হয় না—সমস্যা হয় যত কুতার্কিক, বন্ধ্যাতর্কপরায়ণ ও পণ্ডিতাভিমানীদের সাথে। "My doxy is orthodoxy; heterodoxy is another man's doxy"—এই বিচার অবলম্বনে নিশ্চয়ই উচ্চতর যুক্তিতে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তোমাদের অচৈতন্যপর-যুক্তিপ্রবণতা, সূক্ষ্মবিচার করে দেখ, তার মূলে আছে অচৈতন্যপর ভাব। শাস্ত্রীয় ভাষায় এ'কে 'আসুরিক ভাব'✶ বলা হয়েছে।

---

✶ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ১৬ অধ্যায়ে আসুরিক-ভাবের বিভিন্ন পরিচয় দেওয়া হয়েছে। "**অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরণীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥**" (গীঃ ১৬।৮)। একদল বলছেন,—জগৎ অসত্য, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো তা এক ভ্রান্তিমাত্র এবং 'অপ্রতিষ্ঠ' অর্থাৎ আকাশকুসুমের মতো নিরাশ্রয়। অন্য এক গোষ্ঠী বলছেন,—'অনীশ্বর' অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি প্রভৃতির কারণরূপে কোন ঈশ্বর নেই এবং 'অপরস্পরসম্ভূতম্' অর্থাৎ কার্য্য-কারণের পরস্পর সম্বন্ধে বিশ্বসৃষ্টি হয়নি—হঠাৎ করে হয়েছে। আবার কারও মতে স্বেচ্ছায়ই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—'কামহেতুকম্'। ইত্যাদি।

এইজন্যই 'নিত্যচৈতন্য'-পর সহস্র যুক্তিও তোমাদের ভাবানুকূল হয় না, সুতরাং তা যুক্তিগ্রাহ্যও হয়ে উঠে না।

বর্ণমালার সাথে প্রথম পরিচয়কালেই যদি কেউ যুক্তির অবতারণা করে—'অ কেন অ'? তবে তার পক্ষে নিশ্চয়ই সেই বর্ণমালা আর বরণীয় হয়ে উঠে না। জড়বিজ্ঞান পাঠ-কালে সেই সেই 'Axiom' (স্বতঃসিদ্ধ সত্য) তোমরা কিন্তু যুক্তির অপেক্ষা না করেই তা গলাধঃকরণ করেছ। সেইপ্রকারই আত্মবিজ্ঞান লাভের সময়েও সেই সম্পর্কিত সমস্ত 'Axiom' সংশয়াতীত-ভাবেই গ্রহণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ক্ষেত্রেই তোমরা যত যুক্তির অবতারণা ক'রে সেই অধ্যায় হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হও এবং অচৈতন্য-ভাবকেই যত্ন-সহকারে ও যুক্তি-সহযোগে লালন-পালন কর।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণকে যে তোমরা 'ভাব-বাদী' বলয়ে আবদ্ধ বল, তাতে তোমরা যে 'অভাব-বাদী', তা প্রমাণিত হয়। সুতরাং অভাবী দরিদ্র কিভাবে ধনলাভের মহিমা বুঝবে—বন্ধ্যা নারী কিভাবে গর্ভবতী নারীর অবস্থা অনুভব করবে? শুন তবে হে অভাব-বাদিন্—

**''যতদিন ভবে না হবে না হবে,**
**তোমার অবস্থা আমার মত।**
**শুনে না শুনিবে বুঝে না বুঝিবে,**
**জানাইব আমি যাতনা যত॥''**

তোমাদের সকল যুক্তিই উদর ও উপস্থকে কেন্দ্র করে ভ্রাম্যমান্। তাই তোমাদের বিচারে দেহ ও মনের সম্পর্কে যত লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক অর্থ এবং লৌকিক কাম—এই ত্রিবর্গের যুক্তিই হ'ল যুক্তি। দেহ ও মন উভয়েরই ঊর্দ্ধে যে আত্মা, তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান তোমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য! সকলেই ত' আর তোমাদের সব স্থূল যুক্তি নিয়ে সেই ত্রিবর্গের ত্রিতাপকে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সুখ-দুঃখের অপরিহার্য্য নাগরদোলায় চ'ড়ে, এমন কি, লাগাম-ছাড়া ভোগের মধ্যেও অনেকেই রীতিমত হাঁপিয়ে উঠেন। তখন তাঁরা নিজেদেরকে সেই কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনপর



জানোয়ারদের থেকে কোন পার্থক্য না দেখে মরমে হত হ'তে থাকেন। মানবোচিত চেতনা তখনই সেই মুকুলিত অবস্থা থেকে বিকশিত হতে থাকে। মনুষ্যাকার হয়ে কেবল ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব হওয়া অপেক্ষা আত্মানুসন্ধানই তখন অধিক যুক্তিযুক্ত ও শান্তিপ্রদ ব'লে মনে হতে থাকে। ফলে ত্রিবর্গের যুক্তি তাঁদের কাছে ম্লান হয়ে পড়ে; তখন তাঁরা চতুর্ব্বর্গ 'মোক্ষে'র যুক্তিই তথা আত্মানুশীলনের যুক্তিকেই আঁকড়ে ধরেন। ভায়া! ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্যই হল সেই আত্মানুশীলন—যে-আত্মানুশীলনের একমাত্র পীঠস্বরূপ ভারতভূমির প্রতি সর্ব্ববিশ্ব সর্ব্বদাই নতমস্তক। পাশ্চাত্য দার্শনিকের যে স্বীকারোক্তি—What India thinks today, the whole world thinks tomorrow—তা নিশ্চয়ই তোমাদের জড়চিন্তা, জড়প্রযুক্তিকে লক্ষ্য ক'রে নয়। কারণ, পাশ্চাত্য জগতের জড়প্রযুক্তি (technology) হতে তোমরা অনেকটাই পিছিয়ে আছো। সুতরাং তাঁদের সে-মন্তব্য কেবল ভারতীয় আর্য্য-ঋষি-মুনিগণের আত্মাপর ভাবনা-চিন্তা-গবেষণাকে লক্ষ্য করেই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট চতুর্ব্বর্গ 'মোক্ষ' অপেক্ষাও পঞ্চমবর্গ 'ভগবৎপ্রেমের' যৌক্তিকতা সংস্থাপন করলেন। জগতে যে দুঃখ, সমস্যা ও উদ্বেগের অবিচ্ছিন্ন ধারা, তা ভগবানের প্রতি জীবের বিমুখতারই এক অবশ্যম্ভাবী ফল। যে-প্রকার, এক রাজদ্রোহী 'আমিই রাজা' বলে ঘোষণা করায় রাজরোষে পতিত হয়, সেইপ্রকার 'আমিই প্রভু' অভিমান ক'রে জীব ভগবান্ হতে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টায় সে মহামায়ার দণ্ডযোগ্য হয়ে পড়ে।

দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে রাজনির্দ্দেশে জল্লাদের দ্বারা নদীতে চুবিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় এবং প্রাণবায়ু নির্গত হবার পূর্ব্বেই তাকে জল হতে উত্তোলন ক'রে কিছুক্ষণ নিশ্বাস-গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে সেই ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল ধ'রে আরও বিভিন্নপ্রকার শাস্তি দেওয়া যায়। কারাগারে কারাধ্যক্ষের দেওয়া আহার, বস্ত্র, বাসস্থানের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুগ্রহ নয়—তাঁর শাস্তিপ্রদান-পদ্ধতিরই অন্তর্গত। সে-অবস্থায় কারাধ্যক্ষের সন্তোষ উৎপাদন ক'রে চললে, শাস্তির মাত্রা কিছু লাঘব হতে পারে মাত্র,

কিন্তু কারামুক্তি ঘটে না—কারণ, রাজনির্দ্দেশ ছাড়া কারামুক্তি অসম্ভব। সেইপ্রকার ভগবানের দাসী—বহিরঙ্গা শক্তি 'মহামায়া' কারাধ্যক্ষা-রূপে ভগবদ্বিমুখতার শাস্তি হিসাবে জীবগণকে সর্ব্বদা কোন না কোন দুঃখে নিপতিত রাখেন এবং তাঁর শাস্তিপ্রদান-সূচীরই অঙ্গরূপে মাঝে মাঝে কিছু কিছু জড়সুখের ব্যবস্থাও ক'রে থাকেন। সে-অবস্থায় কারারক্ষিণী মায়াদেবী বা অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণকে তোষণ ক'রে চললে এইজগতে দুঃখের মাত্রা কিছু লাঘব হয় বা কিছু সময়ের জন্য সুখ-সুবিধাদি লাভ হতে পারে মাত্র; কিন্তু তাতে দুঃখের চিরনিবৃত্তি কখনই ঘটে না বা এই চৌদ্দভুবনের চৌহদ্দি থেকে মুক্তিলাভও হয় না।

যে-মুহূর্ত্তে সেই রাজদ্রোহী নিজেকে রাজার অনুগত বলে প্রমাণ করে, এবং রাজাও বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় লাভ করেন, সে-মুহূর্ত্তে সে কারামুক্ত হয়ে রাজার অনুগ্রহ-ভাজন হয়। সেইপ্রকার জীব যেকালে ভগবদ্বিমুখতা পরিত্যাগ ক'রে কায়মনোবাক্যে ভগবদ্দাসত্ব স্বীকার করে এবং ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে তার সেই স্বীকৃতির নিষ্কপটতা অনুভব করেন, সেইকালে তার সমস্ত ক্লেশের পরিসমাপ্তি ঘটে ও 'ভগবৎপ্রেম' লাভের যোগ্যতা সে অর্জ্জন করে।

সুতরাং 'মোক্ষ' বলতে সমগ্র দুঃখের সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিকেই যে অনেকে লক্ষ্য করেন, তা প্রকৃতপক্ষে 'ভগবৎপ্রেম' লাভেরই আনুষঙ্গিক ফল। কারাগার হতে মুক্তিলাভের পর নিজ পরিবারবর্গের সাথে মিলনসুখই যদি লাভ না হল, তবে সেই কারামুক্তিরই বা কি ফল? বরং সেক্ষেত্রে সেই কারামুক্তি তখন অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠে না কি? সুতরাং কারামুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও নিজ পরিবারবর্গের সাথে মিলনসুখ উপভোগের প্রয়োজনীয়তাই অধিক। সেইপ্রকার 'মোক্ষ'ই নয়—'ভগবৎপ্রেম'-আস্বাদনই জীবের পরম প্রয়োজন। সমুদ্রের সঙ্গলাভেই যেমন নদীর সার্থকতা, জলচ্যুত মৎস্যের যেমন জলের আশ্রয়লাভেই তার পরমস্বস্তি, বৃক্ষমূলের সাথে সংযোগরক্ষা-ক্রমেই যেমন পত্র-ফুল-ফলাদির চিরসজীবতা—সেইপ্রকার



শ্রীহরির সঙ্গ-সান্নিধ্যেই জীবাত্মার সর্ব্বতুষ্টি ও পুষ্টি। লৌহকণিকা যেমন কোন শর্তসাপেক্ষে নয়, নিজ-ধর্ম্মবশেই চুম্বকের দিকে ধাবিত হয়; তেমনই কোন ভোগ বা মোক্ষের শর্তে নয়, ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক 'ভাবে'র বশেই জীবের ভগবদ্ভজন।

পরমাত্মা শ্রীহরির সাথে জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধহীন হওয়াতেই জীবের যত ক্লেশ এবং সেই সম্বন্ধ-স্থাপনেই জীবের শাশ্বত শান্তি। সুতরাং সুবুদ্ধিগণ কেবল ত্রিতাপ হতে পরিত্রাণের জন্য মোক্ষের অনুসন্ধান করেন না, বরং ভগবানের সাথে হারিয়ে যাওয়া সম্বন্ধ-স্থাপন ক'রে ভগবৎপ্রেমকেই পরম-প্রয়োজন জ্ঞান করেন। আর সেক্ষেত্রে তোমরা যে সেই পরম প্রয়োজনীয় ভগবদ্ভাবকে উপহাস ক'রে ভগবদ্ভাবের অভাবকেই যুক্তিযুক্ত জ্ঞান কর, তাতেই প্রমাণিত হয়—তোমরা কিপ্রকার শিশুমস্তিষ্ক।

'ভাব', 'প্রেম', 'আনন্দ' প্রভৃতি চেতন বস্তুমাত্রেই চায়, নতুবা অচেতন বস্তুর সাথে আর কি পার্থক্য? হিংস্র প্রাণীও স্নেহ-মমতায় বশীভূত হয়। অত্যন্ত কঠোর-হৃদয় ব্যক্তিও কারও না কারও প্রতি স্নেহশীল হয়ে থাকে। সুতরাং চেতনতার অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা যে কেবল অন্যতমই নয়, বরং সর্ব্বপ্রধান, তা সামান্য বুদ্ধির দ্বারাই বোধগম্য হয়। কিন্তু এই 'ভাব' ও 'প্রেমের' বিষয় যখন একমাত্র ভগবান্ হন, তখনই তা পরমানন্দজনক হয় এবং সেইকালে পরমাত্মা শ্রীহরির সাথে সম্বন্ধের প্রভাবে 'এইটা আমার', 'ওটা তোমার'—এইসব সঙ্কীর্ণ চিন্তার ঊর্দ্ধে স্থিত হওয়ায় সমগ্র বসুধাকেই নিজের আত্মীয় জ্ঞান হতে থাকে।

অপরদিকে দেখা যায়, অনিত্য সম্বন্ধ-গুলিকে নিয়েই যখন কেউ 'আমার আমার' ক'রে জড়প্রেমে মোহিত হয়ে থাকে, তখন তার দুঃখ, উদ্বেগ, অশান্তি প্রভৃতির শেষ থাকে না। এইসব দুঃখময় অভিজ্ঞতার জেরে ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়, চুন খেয়ে গালপোড়া লোক যেমন দই দেখলেও ভয় পায়, তেমনই চেতনধর্ম্মগত এই 'ভাব', 'প্রেম' প্রভৃতির নামেও অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তখন জলাতঙ্ক

রোগীর মতো প্রেমাতঙ্কে আত্মধর্ম্মগত 'প্রেম', 'ভক্তি', 'ভাব'—এসবের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখাতে থাকেন। সেইসকল যুক্তি যেহেতু চেতন-আত্মার সহজাত-ধর্ম্মেরই বিরোধী, অতএব সেই সব যুক্তিকে 'অচৈতন্য-যুক্তি' বলা-ই সঙ্গত। শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশীবাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও এইপ্রকার অচৈতন্য যুক্তি-নির্ভর হয়েই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—

**"মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।**
**ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥"**

পিতা যে-প্রকার তাঁর বিদ্বেষী সন্তানের সাথে বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা করেন না, সেইপ্রকার জগৎপিতা পরমকারুণিক মহাপ্রভু সেই বিদ্বেষী সন্ন্যাসীর প্রতি বিদ্বেষ না ক'রে বরং তাঁর সংশয় মোচনেই অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই বললেন—"দেখুন, আমি নিজের ইচ্ছায় এই কীর্ত্তন-নর্ত্তনাদি করি না। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের স্বভাবই এই যে—নিষ্কপটে সেই নাম গৃহীত হলে হৃদয়কে তা নির্ম্মল দর্পণের মতো স্বচ্ছ ক'রে দেয়; এবং শ্রীনাম সেস্থলে এরূপ 'ভাব' উৎপন্ন করে যে, তাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এমনকি মোক্ষও তখন তুচ্ছ মনে হয় এবং লোকের হাস্য-প্রশংসার প্রতি অবধান-শূন্য করিয়ে তাঁকে কীর্ত্তন-নর্ত্তনে নিযুক্ত করায়।" সেই শুষ্কজ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ তখন মহাপ্রভুর অতুল প্রভাবে শ্রীনামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং অবশেষে তাঁরাও সেই অপ্রাকৃত 'ভাবে'র গ্রাহক হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন,—

**"সেই হতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।**
**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥"**

(চৈঃ চঃ ১।৭।১৪৯)

শুষ্ক মরুভূমিতে আজন্ম বসবাসকারী কারও পক্ষে যেমন সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা কোন দেশের কথা কর্ণগোচর হলেও যেমন তা কল্পনায় আনা সম্ভব হয় না, তেমনই শুষ্কযুক্তি-সর্ব্বস্ব তোমরা এই প্রাকৃত জগতের অতীত যে সেই অপ্রাকৃত ভাবরাজ্য, তার কথা কিভাবে বুঝবে? তাই ভায়া! শুষ্কযুক্তি বর্জ্জন ক'রে একটু ভাবগ্রাহী হও।



ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা-মধ্যে তাঁর সখা অর্জ্জুনকে মাধ্যম ক'রেই সকলকে আত্মবিজ্ঞান ও আত্মনিবেদনের গুহ্যতম উপদেশ প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর সেই নিত্য পরমানন্দময় ধামের সংবাদ দিয়েছিলেন—যেস্থানে জীবকে কখনও কোন শোক-মোহ, রোগ-যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যুর দুর্ব্বিপাকে পতিত হতে হয় না,—যেস্থানে জীব পরমপ্রেমময় শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদনে মগ্ন থাকেন। কিন্তু সহস্র পুণ্যকর্ম্মেও, এমনকি শুষ্কবৈরাগ্যের নিরন্তর চর্চ্চা-দ্বারাও সেই প্রেমময়-ধামে জীবের প্রবেশাধিকার হয় না—জড়বিলাস-মগ্ন কিংবা জড়বিরাগ-পর মানবের মেধা সহস্র প্রয়াসেও সেই রহস্যের প্রান্তে উপনীত হতে পারে না—"**যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ**" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)।

তাহলে কি-প্রকারে জীব শ্রীকৃষ্ণের সেই প্রেমময় ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করবেন, তারও উপায় যখন শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন—"**মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু**" (গীঃ ১৮।৬৫)—'আমাগত চিত্ত হও, আমার সেবা ক'র, আমার পূজা ক'র, আমাকে নমস্কার ক'র'; "**মামেকং শরণং ব্রজ**" (গীঃ ১৮।৬৬)—'একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ ক'র'; "**মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে**" (গীঃ ৭।১৪)—'যারা একমাত্র আমারই শরণাগত হয়, তারাই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করতে পারে' প্রভৃতি, তখন অজ্ঞ মানবেরা গীতার বক্তা স্বয়ং সেই শ্রীভগবান্‌কেই ভুল বুঝতে আরম্ভ করলো—'দেখ, যে নিজের পূজা নিজেই চেয়ে নেয়, সে ত' দাম্ভিক, সে কিভাবে আমাদের পূজ্য হতে পারে?' জীব কোথায় ভগবানের পরমকরুণা অনুভব ক'রে গদ্গদ হবে, তা না ক'রে উল্টে ভগবান্‌কেই দোষারোপ করতে লাগলো!

এই অবস্থায় জীবের উদ্ধারের উপায় কি? না বললেও জীবের অজ্ঞতা ঘুচে না, বললেও জীব ভগবান্‌কে ভুল বুঝে। এমতাবস্থায় শ্রীভগবান্ ছদ্মবেশ ধারণ করেই কলিযুগের জীবগণকে উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এই কারণেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার

অত্যাবশ্যকতা। ভগবান্ জীবের কোন্‌প্রকার আচরণে তাদের নিকট বশীভূত হন, সর্ব্বসমর্থ হয়েও বশ্যজীবের গাঢ় প্রেম উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হন না—সেইটীই তিনি জগদ্‌গুরুর ভূমিকায় জগদ্বাসীকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন—এইটী যে তাঁর কি-প্রকার ঔদার্য্য, দয়া, তা যতখানি ভাববেদ্য, ততখানি ভাষা-প্রকাশ্য নয়। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দেবগণের স্তুতিতে ঘোষিত হয়েছে তাঁর সেই পরমকরুণার কথা, যা পূর্ব্বে কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারগণে এমন কি অবতারী শ্রীকৃষ্ণেও দেখা যায়নি।—

**"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ**
**সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।**
**হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ**
**সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"**

(ভবিষ্যপুরাণ)

অর্থাৎ, যিনি স্বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর কান্তিপুঞ্জে দীপ্যমান্, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি আমাদের হৃদয়-গুহায় সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যা তিনি জগৎকে কখনও দান করেননি, যা তাঁর একান্তই নিজের ভক্তিসম্পত্তি, সেই উন্নতোজ্জ্বল-রস দান করবার জন্য তিনি পরমকরুণাবশতঃ কলিকালে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমপ্রেমময় বাণী আজ সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মনীষি, চিন্তাবিদ্ ও যুক্তিবাদী সমাজের কাছে বিশেষ আদৃত হচ্ছে এবং উত্তরোত্তরভাবে তার আবেদন বর্দ্ধিত হচ্ছে।

**"পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ-গ্রাম।**
**সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"**

(চৈঃ ভাঃ ৩।৪।১২৬)

মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপায়ণে কোন্ না বিদ্বৎসমাজ আজ সেই পরমালোকে উদ্ভাসিত হয়নি? কিন্তু হায়! আলোর নীচে অন্ধকারের মতোই আত্মবিস্মৃত তোমরা কিছু হতভাগা তা হতে বঞ্চিত হয়ে আছ। যাঁর



পূত-পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে আজ ভারতভূমি বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশ সমগ্র বিশ্বের নিকট নমস্য—সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমবন্যা তোমাদের দ্বারস্থ হলেও তোমরা দুষ্কৃতির তাড়নায় তাতে অবগাহন ক'রে ধন্যাতিধন্য হতে পারছো না। বরং তোমাদের দুষ্ট চক্রের চক্রান্তে যেরূপ ভগবান্ ভূত বনে যাচ্ছেন, অপরদিকে ভূত ভগবানে পরিণত হচ্ছে। তাই বহির্ভারতে যেস্থলে যিনি স্বয়ং ভগবান্‌রূপে সর্ব্বত্র পূজিত হচ্ছেন, সেস্থলে সেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী প্রজন্মের কাছে জন্ম-মৃত্যুর অধীন এক বিশেষ সাধকরূপে মাত্র পরিচিত করাচ্ছ! এই না হলে তোমাদের আসুরিক-ভাবের চরিতার্থকরণ! হে গৌড়বাসিগণ! তোমরা গৌড়ীয়নাথ শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপালোক থেকে নিজেদেরকে আর বঞ্চিত না ক'রে তাতে সর্ব্বাত্ম-স্নপনে রত হও। এতে তোমরাই কৃতার্থ হবে। শচীমাতার পুত্রকে তোমরা 'ঘরের যোগী' মাত্র জ্ঞান ক'রে বসো না—সমগ্র বিশ্ববাসী আজ তাঁরই কোটীচন্দ্র সুশীতল চরণছায়ায় প্রাণ জুড়াচ্ছেন—বেদগোপ্য কৃষ্ণপ্রেমের শাশ্বতবাণী সমগ্র সুযুক্তি-প্রিয়গণের হৃদয়ে স্থান ক'রে নিয়েছে। তোমরাই বা বাদ যাবে কেন?

**"পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।**
**বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥**
**'কৃষ্ণ' নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।**
**'চৈতন্য' না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥"**

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ৮।৮-৯)